এ্যাথলেটিকসের বিস্ময় জিম থর্প

ছায়া ও কায়ায় সর্বজনের আকাঙ্ক্ষিত সন্তরণবীর
জনি উইসমূলার

# বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে স্মরণীয় যাঁরা

প্রথম খণ্ড

শ্রীখেলোয়াড়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই ভাদ্র, ১৩৬৩

তিন টাকা
আট আনা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
তারকনাথ প্রেস
২, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪

# উৎসর্গ

৺পিতা ও মাতার
শ্রীচরণে

## লেখকের কথা

মৃত্যু-মুখরা পৃথিবী। মৃত্যুর রথ এগিয়ে চলেছে অবিরাম অবিশ্রান্ত গতিতে মানুষকে গ্রাস করবার জন্যে। কিন্তু মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনেও কোনদিন মানুষ অলস হয়ে বসে থাকেনি। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাধনায়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভাকে চিরশাশ্বত করে রাখতে মানুষ যুগে যুগে কঠিন সাধনা করেছে—যাত্রাপথে এগিয়ে যাবার জন্যে। যাঁরা সেই সাধনায় সফলকাম হয়েছেন তাঁরা মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ থেকে রেহাই না পেলেও গণমনের বর্ণবহুল সিংহাসনে মৃত্যুঞ্জয়ী আসন লাভ করেছেন। তাই তাঁরা স্মরণীয় ও বরণীয়। আগামী দিনের আগন্তুকদের কাছে তাঁরা পথ-প্রদর্শক—প্রেরণার দ্যোতক। সেই সব স্মরণীয় বীরদের নিয়ে তাই যুগে যুগে ইতিহাস রচিত হয়েছে। তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের সাধনা ও সংগ্রামের ইতিবৃত্ত মানুষকে আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

মানুষের বিভিন্ন সার্থক প্রতিভার মধ্যে খেলাধুলার স্থান আজ নগণ্য নয়। জীবনকে সকল মলিনতা থেকে মুক্ত করে যে খেলাধুলা সুস্থ ও সবল মানুষের সৃষ্টি করে—সৃষ্টি করে দরদী, নির্ভীক ও উচ্চমনা মানুষকে, সেই খেলাধুলার অবদান কোন দেশ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু স্বাধীন ভারত সেই খেলাধুলার মহানপথে কতটুকু এগিয়ে যেতে পেরেছে? একমাত্র হকি ছাড়া আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় ভারতের গৌরব করবার আর কি আছে? অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, খেলাধুলায় সকলেই সমান প্রতিভা নিয়ে জন্মায় না বা সকলেই বিশ্বজয়ী হয় না। কিপলিং বলেছেন—

> "When the Great Scorer comes
> To write against your name,
> He writes not that you won or lost
> But how you played the game."

কিন্তু খেলাধুলার মহান আদর্শকে সামনে রেখে নিষ্ঠা ও কঠিন সাধনায় এগিয়ে যাবার সে চেষ্টাই বা কোথায়?

দেশের ও জাতির এই দুর্দিনে আমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। যেখানে যা কিছু অন্যায় বা অস্বাস্থ্যকর, যা কিছু মলিন বা প্রতিবন্ধককর তাকে সরিয়ে যাত্রাপথকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করে দিতে আমাদের সমবেতভাবে চেষ্টা করতে হবে। মাঝে মাঝে ঘন মেঘে আকাশ ঢেকে যায় সত্য, কিন্তু সেই আকাশের বুকেইতো আবার সোনালী আলোর ঝিকিমিকি জেগে ওঠে।

বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে বিভিন্ন খেলাধুলায় যাঁরা শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে গেছেন, তাঁদের অবিস্মরণীয় প্রতিভা, সাফল্যের জন্য নিরলস কঠিন সাধনা আমাদের দেশের জনসাধারণকে খেলাধুলার মহান পথে এগিয়ে যাবার জন্য অনুপ্রাণিত করবে এই আশায় বইখানি আমি লিখেছি। বইটির কলেবর বেড়ে যাবে বলে কুড়িটির বেশী জীবনী দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে দ্বিতীয় খণ্ডে আরও কুড়িটি জীবনী দিয়ে

পাঠকদের সামনে শীঘ্রই হাজির করবার ইচ্ছা মনে আছে। বইটির সকল লেখাই আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তবে লেখাগুলি পুস্তক আকারে প্রকাশ করবার সময়ে কিছু কিছু নতুন অংশ যোগ করে দিতে হয়েছে।

প্রামাণিক নথীপত্রের সাহায্যে সকল সময় লেখার চেষ্টা করেছি। তবুও যদি কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটী থেকে থাকে, সে বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিশেষ উপকৃত হবো।

শ্রীখেলোয়াড়

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে স্মরণীয় যাঁরা' বইয়ের প্রথম খণ্ডে যে কুড়িটি জীবনী দেওয়া হলো এগুলি সংগ্রহ করতে আমি ইউ. এস. আই. এস লাইব্রেরী থেকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য পেয়েছি। এ ছাড়া রুমানিয়া, নেদারল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপ্রতিনিধিদের দপ্তরগুলি এবং বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীও আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

কিন্তু যাঁর উৎসাহ, চেষ্টা এবং আন্তরিক আগ্রহের জন্য বইখানি প্রকাশ করা সম্ভব হলো তিনি হলেন শ্রীমুকুল দত্ত। আমার সাংবাদিক জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সুহৃদ ও শুভাকাঙ্ক্ষীর অকৃপণ সাহায্য ছাড়া বইখানি বর্তমান রূপে প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভব হতো না।

প্রকাশক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও চিত্রশিল্পী শ্রীঅজিত গুপ্ত মহাশয় তাঁদের নিজস্ব বিশেষ রুচিবোধ নিয়ে বইটির যে রূপ দিয়েছেন, তাতে তাঁরা আমার মত অনেকের প্রশংসাভাজন হবেন বলে আশা করি।

লেখক

অনন্য ও চিরস্মরণীয় ধ্যানচাঁদ

# ধ্যানচাঁদ

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের পরিচয় হকি খেলায়। পর পর পাঁচটি অলিম্পিকে বিশ্ববিজয়ীর জয়মাল্যে ভূষিত তার কণ্ঠ। ক্রীড়া ইতিহাসে এই সাফল্য নবতম গৌরবের ধারক। গণমনের বর্ণবহুল সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ভারতের হকি আসন।

ভারতের এই প্রতিভাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে যিনি সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছেন তিনি হলেন ধ্যানচাঁদ। ভারতীয় হকির এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তাঁর ছন্দোময় খেলায় নিউজিল্যাণ্ডবাসী জনসাধারণের মনে প্রথম আলোড়ন তোলেন ১৯২৬ সালে। তারপর সেই আলোড়নের উত্তাল তরঙ্গমালা এসে আঘাত করে আমস্টার্ডাম, লস এঞ্জেলস্ ও বার্লিন অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনে—ইংলণ্ডবাসীর মনের মণিকোঠায়। ইংলণ্ডের জনসাধারণ ধ্যানচাঁদের হকি খেলার অপরূপ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে যাদুকর নামে অভিহিত করে—কেউ বা বলে ধ্যানচাঁদ 'হিউম্যান ঈল', যার বাংলা মানে করলে দাঁড়ায় 'মানুষরূপী বানমাছ।' বিশ্বের সকল প্রান্তের অগণিত নরনারী মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে দেখে ধ্যানচাঁদের হকির যাদু। দেখে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মাণী, বেলজিয়াম এবং হাঙ্গেরীর জনসাধারণ স্বপ্নাবিষ্টের মত তাঁর খেলা। ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে ফুরার হিটলারের সম্মুখে হকি খেলার মাধুর্য সুষমায় তিনি নাৎসী জনসাধারণের চোখে যে মায়াকাজল পরিয়ে দেন, তাতে ছুটে আসে তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করতে। দিকে দিকে ধ্বনিত হতে থাকে তাঁর হকি খেলার রূপময় কাহিনী। তারপর বিশ্ববাসী ধ্যানচাঁদকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মানের ডালি উপহার দিয়ে তাঁকে বিশ্বশ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেয়।

সৈনিকের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে কেটেছে ধ্যানচাঁদের সারা জীবন, অবশ্য আজও তাঁর সৈনিক-জীবন শেষ হয়নি। এই মুখচোরা রাজপুত ব্রাহ্মণ হকি খেলাকে ভালবেসেছেন তাঁর সমস্ত প্রাণ দিয়ে। সাধারণের প্রশংসা থেকে সভয়ে তিনি দূরে থেকেছেন—যাত্রাপথের আলোক সঠিকভাবে অনুধাবন করবার জন্যে। আজ ভারতীয় দলে ধ্যানচাঁদের অনুপস্থিতিতেও ভারতের গৌরব-পতাকা উড্ডীন রয়েছে, কিন্তু তবুও ধ্যানচাঁদের কথাই বার বার মনে হয়। আজকের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের মধ্যে ধ্যানচাঁদের সেই অনন্যপ্রতিভা কোথায়? কোথায় সেই চিরসুন্দরের মন-ভোলানো প্রাণমাতানো হকি খেলা? ধ্যানচাঁদ তাই অনন্য, তাই তিনি চিরস্মরণীয়—চিরসুন্দর।

১৯০৫ সালের ২৯শে আগস্ট উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত এলাহাবাদে এক রাজপুত ব্রাহ্মণ পরিবারে ধ্যানচাঁদের জন্ম হয়। জাতিতে রাজপুত হলেও রাজপুতানা ত্যাগ করে তাঁরা প্রথমে এলাহাবাদ ও পরে ঝাঁসিতে বসবাস করেন। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি মধ্যম। পিতা ও বড় ভাই ছিলেন সৈনিক। ছোট ভাই রূপ সিং ভারতীয় হকির আর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ধ্যানচাঁদ-রূপসিং ভারতীয় হকির দুই অনন্য ভ্রাতৃযুগল। ছেলেবেলা থেকেই ধ্যানচাঁদ জানতেন পরিবারের অন্য সকলের মত তাঁকেও সৈনিকের জীবন বেছে নিতে হবে। তাই লেখাপড়া বেশী কিছু শেখার কথা তিনি বা সংসারের কেউ কখনো ভাবেননি। ১৯২১ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে দিল্লীতে প্রথম 'ব্রাহ্মিণ রেজিমেণ্টে' সাধারণ সিপাই হিসাবে সৈন্য বিভাগে তিনি যোগদান করেন।

প্রথম 'ব্রাহ্মিণ রেজিমেণ্টে' বালে তেওয়ারী নামে একজন সুবেদার মেজর ছিলেন। বালে তেওয়ারী শুধু সুবেদার মেজরই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দক্ষ হকি খেলোয়াড়, খেলার উগ্র সমর্থক। অমায়িক, নিরীহ, মুখচোরা ধ্যানচাঁদকে তিনি খুব স্নেহ করতেন।

এই বালে তেওয়ারীর কাছেই ধ্যানচাঁদের হকি খেলার প্রথম হাতেখড়ি। তিনি বিশ্ব হকির গুরুজি ধ্যানচাঁদের হকি গুরু।

সৈন্যদলের মধ্যে এই সময় হকি খেলার প্রচলন ছিল খুব বেশী। সকাল সন্ধ্যা যখন খুশী কয়েকজন একসঙ্গে হলেই চলতো খেলা। স্টিকের মাথায় বল নিয়ে চটুল ভঙ্গিমায় বিপক্ষের খেলোয়াড়দের ধোঁকা দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মাঝে ধ্যানচাঁদ পেতেন অভূতপূর্ব আনন্দ। আস্তে আস্তে সৈন্যদলের মধ্যে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। সৈনিকদের আন্তঃবিভাগীয় খেলায় তিনি শুধু নিজ দলকে বিজয়ীর জয়মাল্যই এনে দেন না—তাঁকে সৈন্যবিভাগের সকল দলগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

১৯২২ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত একমাত্র সৈন্য বিভাগের মধ্যেই তাঁর খেলা সীমাবদ্ধ থাকে। এই সময় একটি ফৌজী হকি দল নিউজিল্যাণ্ড সফর করবে বলে স্থির হওয়ায় ধ্যানচাঁদের মনের গহন কোণে এই সফরের অন্যতম খেলোয়াড় হিসাবে নির্বাচিত হবার সাধ জাগে। কোন অবস্থাতেই কারো কাছ থেকে কোন অনুগ্রহ না নেবার শিক্ষাই তিনি লাভ করে এসেছেন শৈশব থেকে। তাই মুখচোরা ধ্যানচাঁদ কঠোর অনুশীলনের মাঝে তাঁর মনের সেই আশাকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করতে থাকেন। এক সুন্দর প্রভাতে তাঁর কম্যাণ্ডিং অফিসার যেদিন তাঁকে ডেকে এই সফরে নির্বাচিত হবার সংবাদ দেন, সেদিন তাঁর আনন্দের সীমা থাকে না। নিশ্চল হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কোনরকমে অভিবাদন সেরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি ছুটে যান তাঁর ব্যারাকে সহকর্মীদের মাঝে। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে তিনি এই সংবাদ প্রচার করে বেড়াতে থাকেন। বন্ধুদের অভিনন্দনে ও আলিঙ্গনে তাঁর বুক ভরে ওঠে নতুন আশায়।

এই সফরে ফৌজীদলের জয়ডঙ্কা বাজতে থাকে নিউজিল্যাণ্ডের সকল প্রান্তে। বিদেশে ভারতীয় হকির অবিস্মরণীয় প্রতিভার গুঞ্জরণ

সুরু হয়। ধ্যানচাঁদ হয়ে ওঠেন আলোচনার বস্তু। নিউজিল্যাণ্ড-বাসীরা তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভায় বিস্মিত হয়। এই সফর থেকে ফিরে ভারতেও ধ্যানচাঁদের নাম ছড়িয়ে পড়ে ঘরে ঘরে। সামরিক জীবনেও আসে পদোন্নতি—সিপাই থেকে ল্যান্স-নায়ক।

১৯২৮ সালে ভারতীয় হকি দল প্রথম যোগদান করে বিশ্ব-অলিম্পিকে। আন্তঃপ্রাদেশিক খেলার মধ্য দিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা নির্বাচিত হবেন বলে স্থির হয়। কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই প্রথম আন্তঃপ্রাদেশিক খেলায় উত্তর প্রদেশ দলের আক্রমণভাগের উৎসস্বরূপ ধ্যানচাঁদের প্রশংসায় কলকাতার ময়দানের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। নির্বাচকমণ্ডলী দ্বিধাহীনচিত্তে ভারতীয় আক্রমণ-ভাগের গুরুদায়িত্ব ধ্যানচাঁদের ওপর ন্যস্ত করেন। ১৯২৮ সালের ১০ই মার্চ 'কাইজার-ই-হিন্দ' জাহাজযোগে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা যেদিন বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করেন, সেদিন ভারতীয় জনসাধারণ তাঁদের সম্বর্ধনা জানাতে জাহাজঘাটে উপস্থিত হয় না। কিন্তু অবহেলিত ভারতীয় হকির সেই নওজোয়ানদের বুকের মাঝে সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে দোল খেতে থাকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতকে পরিচিত করবার এক দুর্দমনীয় দুর্জয় সঙ্কল্প।

অলিম্পিকের প্রতিযোগিতায় যোগদানের আগে লণ্ডনে ভারতীয় দল ১১টি খেলায় জয়ী হলেও তার সকল সংবাদ স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোপন করে লণ্ডনের সকল দৈনিক সংবাদপত্র। কিন্তু একটি প্রতিভা শয়নে-স্বপনে তাদের বিচলিত করতে থাকে। সেই বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ধ্যানচাঁদকে অভিনন্দিত করে তারা 'হকি যাদুকর' ও 'হিউম্যান ঈল' নামে। অলিম্পিকের খেলায় পরাজিত হয় অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয়—ফাইন্যালে হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। ফিরোজ খাঁন, সৌকত আলী, খের সিং ভারতের এই তিন দিক্‌পাল খেলোয়াড় হয়ে পড়েন অসুস্থ। অধিনায়ক জয়পাল সিং অনুপস্থিত। ধ্যানচাঁদ তীব্র জ্বরের তাড়নায়

অর্ধচেতন। ম্যানেজার মিঃ রসার উন্মাদের মত ছুটে এসে আছড়ে পড়েন ধ্যানচাঁদের বুকে। তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেন—"তুমি না সৈনিক, আজ ভারতের এই চরম পরীক্ষার দিনে তোমার স্থান কি শয্যায় ? ভারতকে যেমন করে হোক বিজয়ীর জয়মাল্য তোমাকেই আজ এনে দিতে হবে।" অভুক্ত—অসুস্থ সৈনিক তাঁর হাতিয়ার হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন মাঠে। তাঁর দুর্বার আক্রমণে হল্যাণ্ডের রক্ষণব্যূহ মুহুর্মুহুঃ ভেঙে পড়ে। বারবার তিনবার পরাজিত হয় হল্যাণ্ডের গোলরক্ষক। ১৯২৮ সালের ২৬শে মার্চ ভারত লাভ করে বিশ্ব হকির বিজয় মুকুট। ২৯শে আগস্ট সহ-খেলোয়াড়দের সঙ্গে ধ্যানচাঁদ অলিম্পিকের স্বর্ণপদক লাভ করেন।

অলিম্পিক থেকে ভারতে ফিরে আসার পর ধ্যানচাঁদের নাম ভারতের ঘরে ঘরে আরাধ্য দেবতার মত ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩২ সালে লস এঞ্জেলস অলিম্পিকের জন্য কোন ট্রায়াল খেলায় যোগদান না করেই তিনি নির্বাচিত হন। অলিম্পিক ফাইন্যালে আমেরিকার বিরুদ্ধে ২৪টি গোল করে নবতম রেকর্ডের সৃষ্টি করে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা। অলিম্পিক বিজয়ের পর ভারতীয় দল হল্যাণ্ড, জার্মাণী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরী সফর করে। জয় তো সামান্য কথা, সকল দেশের জনসাধারণ বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে দেখে ভারতীয় হকির উন্নত কৌশল—দেখে তারা হকি যাদুকর ধ্যানচাঁদের অনুপম খেলার চারুসুষমা। চেকোশ্লোভাকিয়ার এক সুন্দরী তরুণী একটি খেলার পর ধ্যানচাঁদকে জড়িয়ে ধরে কাতর অনুনয় করে বলেন, "তুমি পার্থিব মানুষ নও, তুমি নিশ্চয়ই দেবদূত। শুধুমাত্র একটিবার আমার রক্তিম অধরে তোমার অধর স্পর্শ করে আমার জীবন ধন্য করো—আমার আকাঙ্ক্ষিত বাসনা পূর্ণ করো।" কিন্তু মুখচোরা লাজুক ব্রাহ্মণ ধ্যানচাঁদ সুন্দরী যুবতীর কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করেন না। নিজের আত্মজীবনীর মধ্যে ধ্যানচাঁদ এই ঘটনা প্রথমে উল্লেখ করেননি। এক বন্ধু স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় তিনি ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। যুবতীর

মনোবাসনা পূর্ণ না করার কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন—বিবাহিত জীবনের বাধা এবং শালিনতাবোধ তাঁকে সুন্দরী তরুণীর রক্তাভ ওষ্ঠাধরের আকর্ষণ থেকে বিরত রাখে। যাই হোক, অপরাজিত গৌরব নিয়ে দেশে ফিরে আসে ভারতীয় হকি দল সফর থেকে। ধ্যানচাঁদ ১৩৩টি গোল করে সর্বাপেক্ষা বেশী গোলদাতার সম্মান লাভ করেন। ভারতে ফিরে আসার পর এই সময়কার ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভাপতি মিস্টার হ্যেমানের চেষ্টায় রেলওয়েজ-এ ভালো চাকুরী পাবার আশায় ধ্যানচাঁদ সৈন্যবিভাগ ত্যাগ করবেন কি না যখন ভাবছেন—তখন সৈন্যবিভাগের কর্তারা তাঁর ভবিষ্যৎ উপেক্ষিত হবে না —এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তিনি সৈন্য বিভাগেই থেকে যান এবং ল্যান্স-নায়ক থেকে নায়কের পদে উন্নীত হন।

১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে কারোয়াইতে ঝাঁসী হিরোজ দলের অধিনায়ক হিসাবে মানভাদার দলকে পরাজিত করায় কারোয়াই-এর নবাব পুরস্কার বিতরণের সময় ধ্যানচাঁদকে 'খিলাত' দান করেন। দু'বছর ব্যবধানে তাঁর দীর্ঘদিনের এক অতৃপ্ত ও অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ হয়, ১৯৩৩ সালে ঝাঁসী হিরোজ দলের হয়ে শক্তিশালী ক্যালকাটা কাস্টমসকে পরাজিত করে বাইটন কাপ লাভ করায়। ক্যালকাটা কাস্টমসের বিরুদ্ধে এই খেলাটিকে তিনি তাঁর জীবনের সব থেকে স্মরণীয় খেলা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সৈকত আলী, আসাদ আলী, ডিফোল্টস, সিম্যান, মেগসিন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত কাস্টমস দলকে পরাজিত করে তিনি সেদিন যে আনন্দলাভ করেছিলেন —অলিম্পিকের বিভিন্ন খেলায় বা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অন্য কোন খেলাতেই সেরূপ আনন্দের মাধুর্য তিনি আর উপভোগ করতে পারেননি।

১৯৩৪ সালে ওয়েস্টার্ণ এশিয়াটিক গেমসে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেন তিনি। ১৯৩৫ সালে যে ভারতীয় হকি দল নিউজিল্যাণ্ড সফর করে অপরাজিত অবস্থায় স্বদেশে ফিরে আসে,

সেই দলেরও অধিনায়ক ছিলেন ধ্যানচাঁদ। নিউজিল্যাণ্ড সফরে সর্বাপেক্ষা বেশী ২০১টি গোল করার সম্মানও তিনি লাভ করেন। এর পর ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের অধিনায়কত্বের ভার পড়ে ধ্যানচাঁদের উপর। উপর্যুপরি তৃতীয়বার হকি খেলায় অলিম্পিক বিজয়ী হিসাবে ঘোষিত হয় ভারতের নাম। এই সফরেও সর্বাপেক্ষা বেশী ৫৯টি গোল করার কৃতিত্ব লাভ করেন তিনি। ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত একমাত্র সামরিক বাহিনীর মধ্যেই তাঁর খেলা সীমাবদ্ধ থাকে। ১৯৩৮ সালে তিনি 'ভাইসরয়েস কমিশন' লাভ করে জমাদারের পদে উন্নীত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষাশেষি এক ফৌজী হকি দল তাঁর নেতৃত্বে মণিপুর, বর্মা, দূরপ্রাচ্য এবং সিংহল সফর করে।

১৯৪৭ সালে পূর্ব আফ্রিকা এশিয়ান স্পোর্টস এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে ধ্যানচাঁদের নেতৃত্বে যে ভারতীয় দলটিকে পূর্ব আফ্রিকা সফরে পাঠান হয়, তারা ২৮টি খেলাতে অংশ গ্রহণ করে। তারা ২৮টিতেই বিজয়ী হয়ে স্বদেশে ফিরে আসে। ধ্যানচাঁদের অস্তোন্মুখ প্রতিভার শেষ লোহিত আভায় রক্তাভ হয়ে ওঠে নিউজিল্যাণ্ডের আকাশ। এই সফরে ৬১টি গোল করে তিনি তাঁর প্রতিভাদীপ্ত খেলোয়াড় জীবনের শেষ স্মৃতির স্বাক্ষর রেখে যান।

১৯৪৮ সাল থেকেই প্রথম শ্রেণীর খেলা থেকে ধ্যানচাঁদ অবসর নেন। ১৯৪৯ সালের মে মাসে কলকাতায় লণ্ডন অলিম্পিক বিজয়ী ভারতীয় দল ও অবশিষ্ট দলের যে প্রদর্শনী খেলা হয় সেই খেলায় অবশিষ্ট দলের অধিনায়ক হিসাবে শেষ প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ করে প্রথম শ্রেণীর খেলা থেকে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। খেলার বিরতির সময়ে বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন ভারতীয় হকি ইতিহাসে তাঁর অকৃপণ দানের কথা উল্লেখ করে অভিনন্দিত করেন। এই খেলার পর থেকেই তিনি তাঁর প্রিয় খেলা একরূপ ত্যাগ করেন বলা চলে।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের আজকের খেলা তাঁর মনকে পরিপূর্ণভাবে আনন্দ দিতে পারে না। ভারতীয় হকির মান আজ নিম্নমুখী। তাই তাঁর মনে বড় ভয়, বড় শঙ্কা, বহুকষ্টে অর্জিত আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় ভারতের একমাত্র সম্মান যদি হস্তচ্যুত হয়! সেই কারণেই আজকের ও আগামী দিনের খেলোয়াড়দের উদাত্ত কণ্ঠে তিনি আহ্বান করে বলেছেন,—

"Keep the flag of India flying."

সামরিক জীবনে ১৯৪৩ সালে 'কিংস কমিশন' লাভ করে তিনি লেফ্‌টেন্যান্ট হন। ১৯৪৮ সালে ক্যাপ্টেন এবং বর্তমানে তিনি মেজর পদে অধিষ্ঠিত। স্ত্রী ও পাঁচটি সন্তান নিয়ে তাঁর শান্তির সংসার। ভারতীয় হকির উন্নতির যে কোন সাহায্যের জন্য তাঁর দ্বার সব সময়েই উন্মুক্ত।

বড়ই আনন্দের কথা যে, আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় ভারতের গৌরবকে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করতে যাঁর অকৃপণ সাহায্যের সব থেকে বেশী প্রয়োজন হয়েছিল—সেই অনন্যপ্রতিভার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হয়নি স্বাধীন ভারত। ১৯৫৬ সালে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি হকি খেলার সেই অবিস্মরণীয় প্রতিভার মর্যাদা দিয়েছেন 'পদ্মভূষণ' উপাধির মাধ্যমে।

দূরপাল্লা সাঁতারের জনক ক্যাপ্টেন ম্যাথুওয়েব

## ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েব

কোন্ দেশের কোন্ মানুষ যে কবে এবং কোথায় সাঁতার দিয়েছিল সে কথা ইতিহাসে লিখিত হয়নি। শুধু এইটুকুই ঐতিহাসিকেরা বলেছেন যে, মানুষ বাঁচবার তাগিদেই পশুদের সাঁতার দেওয়া দেখে পশুদের মত করেই অনবরত হাত-পা নেড়ে সাঁতার দিতে শিখেছিল। একদিন প্রয়োজনের তাগিদে যে সাঁতার মানুষ শিখেছিল পরবর্তী যুগে কোনদিনই সেই সাঁতার মানুষের দ্বারা উপেক্ষিত হয়নি। যুগে যুগে তার আসন ক্রমশই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সেই প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছেন, কণ্টকমুক্ত করেছেন যিনি, যিনি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সাঁতারের উত্তেজনা ও উন্মাদনাকে ছড়িয়ে দিয়ে এক দুর্বার আকর্ষণে মানুষকে অগাধ জলরাশি অতিক্রম করতে —তরঙ্গসঙ্কুল বিক্ষুব্ধ নদ-নদীকে উপেক্ষা করতে শিখিয়েছেন, তিনি হলেন ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েব। মানুষ যদি সাঁতারকে উন্নতভাবে আয়ত্ত করতে পারে—দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায় ইপ্সিত ফললাভের জন্য যদি মনোবলকে দৃঢ় করতে পারে, তাহলে সমুদ্র, নদ, নদীর দুর্বার স্রোতকে উপেক্ষা করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো সম্ভব। সাঁতারে এই শিক্ষা ও সাহসের উদ্গাতা হলেন ক্যাপ্টেন মাথু ওয়েব।

দূরপাল্লার সাঁতার তখনও পৃথিবীতে বিশেষভাবে প্রচলিত হয়নি। এমনি এক সময়ে এক ইংরেজ নাবিকের মনে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করবার দুরাশা দেখা দেয়। বরফগলা ইংলিশ চ্যানেলের ঠাণ্ডা জল অথচ দুরন্ত তার স্রোত। অসংখ্য ভয়াবহ সামুদ্রিক প্রাণীর আবাসস্থল ইংলিশ চ্যানেল। সেই ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার দিয়ে অতিক্রম করার কথা মানুষ কল্পনাও করেনি সেদিন নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গন করা হবে জেনে। কিন্তু এক চিরদুরন্ত, দুর্মদ, দুর্দম প্রাণের পেয়ালা মদে ভরপুর করে মানুষের দুর্জয় ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে ডোভার থেকে নেমে পড়লেন ১৮৭৫ সালের ২৪শে আগস্ট ইংলিশ চ্যানেলের

বুকে। অবিরত ২১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ধরে সাঁতার কেটে, সকল বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করে ১৯ মাইল তরঙ্গসঙ্কুল বরফশীতল ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ফ্রান্সের উপকূলবর্তী কেপ গ্রিজ নেজ-এ এসে পৌঁছুলেন যে অসমসাহসী বীর—তিনি হলেন ক্যাপ্টেন মাথু ওয়েব। ইতিহাস দূরপাল্লার সাঁতারের জনক হিসাবে তাঁকে অভিহিত করলো। সমস্ত পৃথিবী ম্যাথু ওয়েবের বীরত্বে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলো। মানুষ নিজের অপরিমিত শক্তির কথা চিন্তা করবার সুযোগ পেলো।

অতি শৈশবে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টাতেই সাঁতার শিক্ষা করে তিনি জলকে আলিঙ্গন করতে শেখেন। সেই জলরাশির দুরন্ত আকর্ষণে তাঁকে ভবিষ্যৎ জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাতে হয় জলের বুকেতেই। তরঙ্গসঙ্কুল অগাধ দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি তাঁকে মুগ্ধ করতো—তাঁর মনে প্রেরণা ও সাহস যোগাতো। অপরিমিত শান্তির খোরাক এই জলরাশির কাছ থেকেই তিনি লাভ করতেন। তাই একাধারে যশ, মান, অর্থ ও কৃতিত্ব তিনি যেমন ঐ জলরাশির বক্ষ বিদীর্ণ করে লাভ করেন তেমনি চিরশান্তি, মহাশান্তি মৃত্যুও এই জলরাশিই তাঁকে এনে দেয়। জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে আজও ক্যাপ্টেন ওয়েব চির-উজ্জ্বল। দূরপাল্লার সাঁতারের পথপ্রদর্শক। দুরন্ত আশায় সন্তরণে কোন দুর্বার বাধা অতিক্রমের প্রেরণার দ্যোতক। ম্যাথু ওয়েব চির-স্মরণীয়। মৃত্যুঞ্জয়ী।

ওয়েব ১৮৪৮ সালে ইংলণ্ডের অন্তর্গত শর্পসায়ারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন চিকিৎসক। সাত ভাই ও চার বোনে মিলে হৈ-চৈ করেই দিন কাটতো। কিন্তু ভাইবোনদের মধ্যে সব থেকে বেশী ডান-পিটে ছিলেন ম্যাথু। বড় বড় ভাইবোনেরা বা সমবয়স্ক বন্ধুবান্ধবেরা যেসব কাজ করতে ভয় পেতো বা দ্বিধা করতো, ম্যাথু হাসিমুখে এগিয়ে যেতেন সব থেকে আগে সেই কাজ করতে। লাফাতে-ঝাঁপাতে, গাছে উঠতে বা পাহাড়ে চড়তে কেউ তার সঙ্গে পেরে উঠতো না। অজানাকে জানবার, অদেখাকে দেখবার বা অসম্ভবকে সম্ভব করবার স্পৃহা

মানুষের মনে যুগে যুগে এসেছে বলেই মানুষ এগিয়ে গিয়েছে বিপদের মুখে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে। নব নব ইতিহাস রচিত হয়েছে সেই সব বীরদের নিয়ে যাঁরা সেই সব অজানাকে জেনেছেন, অদেখাকে দেখেছেন বা অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। ওয়েবের শৈশব থেকেই মনের মণিকোঠায় এই স্পৃহা জেগেছিল।

জলের প্রতি তাঁর ছিল জন্মগত টান। বাড়ির অতি কাছেই ছিল সেভার্ন নদী। সেই সেভার্ন নদীতে তাঁকে দেখা যেতো যখন-তখন সাঁতার কাটতে। এমনকি, রাত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন বাত্যাবিক্ষুব্ধ সেভার্ন নদীতে সাঁতার দিতে একটুকু ভয় বা শঙ্কা হতো না অতি শৈশব অবস্থা থেকেই। পাঠ্যজীবন শেষ করে পাছে তাঁর সঙ্গে জলের নিবিড় সম্পর্কের মধ্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় এই আশঙ্কায় ম্যাথু সংসারের সকল অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করে নাবিকের জীবন বেছে নেন। সাধারন নাবিকের জীবন থেকে নিজের কমদক্ষতায় তিনি পরবর্তীকালে জাহাজের ক্যাপ্টেন হবার গৌরবও লাভ করেন। একবার তিনি 'রাশিয়া' নামে এক জাহাজ নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে ফিরছেন। মাঝ পথে এলো ভীষণ ঝড়। জাহাজ বুঝি ডোবে ডোবে। এমন অবস্থায় এক নাবিক পড়ে যায় সমুদ্রের মাঝে। তখন ঝড়ের দাপটে সমুদ্রের ঢেউগুলি হয়ে পড়েছে উন্মাদ। হাজার হাজার পর্বত-সমান ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে জাহাজের গায়। যে বাত্যাবিক্ষুব্ধ, অশান্ত, উত্তাল সমুদ্র মানুষ বহুদূরে দাঁড়িয়ে দেখে ভয় পায়, ম্যাথু সেই সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েন নিমেষে, সহকর্মী নাবিককে উদ্ধার করবার জন্যে।

নাবিকের জীবন সুরু করা থেকেই ইংলিশ চ্যানেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় প্রগাঢ় ও নিবিড় হয়। ইংলিশ চ্যানেলের বুকের উপর দিয়ে যখন তাঁর জাহাজ যেতো তখন তিনি বসে বসে ভাবতেন, এই ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হওয়া কি অসম্ভব?—মানুষের ক্ষমতা কি এতোই সীমাবদ্ধ যে দীর্ঘ ২০ মাইল বিরামহীন সাঁতার সে কাটতে

বুকে। অবিরত ২১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ধরে সাঁতার কেটে, সকল বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করে ১৯ মাইল তরঙ্গসঙ্কুল বরফশীতল ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ফ্রান্সের উপকূলবর্তী কেপ গ্রিজ নেজ-এ এসে পৌঁছুলেন যে অসমসাহসী বীর—তিনি হলেন ক্যাপ্টেন মাথু ওয়েব। ইতিহাস দূরপাল্লার সাঁতারের জনক হিসাবে তাঁকে অভিহিত করলো। সমস্ত পৃথিবী ম্যাথু ওয়েবের বীরত্বে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলো। মানুষ নিজের অপরিমিত শক্তির কথা চিন্তা করবার সুযোগ পেলো।

অতি শৈশবে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টাতেই সাঁতার শিক্ষা করে তিনি জলকে আলিঙ্গন করতে শেখেন। সেই জলরাশির দুরন্ত আকর্ষণে তাঁকে ভবিষ্যৎ জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাতে হয় জলের বুকেতেই। তরঙ্গসঙ্কুল অগাধ দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি তাঁকে মুগ্ধ করতো—তাঁর মনে প্রেরণা ও সাহস যোগাতো। অপরিমিত শান্তির খোরাক এই জলরাশির কাছ থেকেই তিনি লাভ করতেন। তাই একাধারে যশ, মান, অর্থ ও কৃতিত্ব তিনি যেমন ঐ জলরাশির বক্ষ বিদীর্ণ করে লাভ করেন তেমনি চিরশান্তি, মহাশান্তি মৃত্যুও এই জলরাশিই তাঁকে এনে দেয়। জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে আজও ক্যাপ্টেন ওয়েব চির-উজ্জ্বল। দূরপাল্লার সাঁতারের পথপ্রদর্শক। দুরন্ত আশায় সন্তরণে কোন দুর্বার বাধা অতিক্রমের প্রেরণার দ্যোতক। ম্যাথু ওয়েব চির-স্মরণীয়। মৃত্যুঞ্জয়ী।

ওয়েব ১৮৪৮ সালে ইংলণ্ডের অন্তর্গত শর্পসায়ারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন চিকিৎসক। সাত ভাই ও চার বোনে মিলে হৈ-চৈ করেই দিন কাটতো। কিন্তু ভাইবোনদের মধ্যে সব থেকে বেশী ডানপিটে ছিলেন ম্যাথু। বড় বড় ভাইবোনেরা বা সমবয়স্ক বন্ধুবান্ধবেরা যেসব কাজ করতে ভয় পেতো বা দ্বিধা করতো, ম্যাথু হাসিমুখে এগিয়ে যেতেন সব থেকে আগে সেই কাজ করতে। লাফাতে-ঝাঁপাতে, গাছে উঠতে বা পাহাড়ে চড়তে কেউ তার সঙ্গে পেরে উঠতো না। অজানাকে জানবার, অদেখাকে দেখবার বা অসম্ভবকে সম্ভব করবার স্পৃহা

মানুষের মনে যুগে যুগে এসেছে বলেই মানুষ এগিয়ে গিয়েছে বিপদের মুখে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে। নব নব ইতিহাস রচিত হয়েছে সেই সব বীরদের নিয়ে যাঁরা সেই সব অজানাকে জেনেছেন, অদেখাকে দেখেছেন বা অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। ওয়েবের শৈশব থেকেই মনের মণিকোঠায় এই স্পৃহা জেগেছিল।

জলের প্রতি তাঁর ছিল জন্মগত টান। বাড়ির অতি কাছেই ছিল সেভার্ন নদী। সেই সেভার্ন নদীতে তাঁকে দেখা যেতো যখন-তখন সাঁতার কাটতে। এমনকি, রাত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন বাত্যাবিক্ষুব্ধ সেভার্ন নদীতে সাঁতার দিতে এতটুকু ভয় বা শঙ্কা হতো না অতি শৈশব অবস্থা থেকেই। পাঠ্যজীবন শেষ করে পাছে তাঁর সঙ্গে জলের নিবিড় সম্পর্কের মধ্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় এই আশঙ্কায় ম্যাথু সংসারের সকল অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করে নাবিকের জীবন বেছে নেন। সাধারন নাবিকের জীবন থেকে নিজের কর্মদক্ষতায় তিনি পরবর্তীকালে জাহাজের ক্যাপ্টেন হবার গৌরবও লাভ করেন। একবার তিনি 'রাশিয়া' নামে এক জাহাজ নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে ফিরছেন। মাঝ পথে এলো ভীষণ ঝড়। জাহাজ বুঝি ডোবে ডোবে। এমন অবস্থায় এক নাবিক পড়ে যায় সমুদ্রের মাঝে। তখন ঝড়ের দাপটে সমুদ্রের ঢেউগুলি হয়ে পড়েছে উন্মাদ। হাজার হাজার পর্বত-সমান ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে জাহাজের গায়। যে বাত্যাবিক্ষুব্ধ, অশান্ত, উত্তাল সমুদ্র মানুষ বহুদূরে দাঁড়িয়ে দেখে ভয় পায়, ম্যাথু সেই সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েন নিমেষে, সহকর্মী নাবিককে উদ্ধার করবার জন্যে।

নাবিকের জীবন সুরু করা থেকেই ইংলিশ চ্যানেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় প্রগাঢ় ও নিবিড় হয়। ইংলিশ চ্যানেলের বুকের উপর দিয়ে যখন তাঁর জাহাজ যেতো তখন তিনি বসে বসে ভাবতেন, এই ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হওয়া কি অসম্ভব ?—মানুষের ক্ষমতা কি এতোই সীমাবদ্ধ যে দীর্ঘ ২০ মাইল বিরামহীন সাঁতার সে কাটতে

পারে না? এই সব প্রশ্নই বার বার তাঁর মনে উদয় হতো। মানুষের এই পরাজয় তিনি কিছুতেই মাথা পেতে নিতে পারতেন না। সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করলেও স্ত্রী-পুত্রের স্নেহ-মমতা কোনদিনই তাঁকে ঘরে আটকে রাখতে পারে না।

১৮৭৫ সালে পল বয়টন নামে একজন মার্কিণ সাঁতারু যখন রবার-নির্মিত 'লাইফ সেভিং স্যুট' পরে ইংলিশ চ্যানেল পার হন, তখন ম্যাথু তাঁর দীর্ঘদিনের সঞ্চিত আশাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন। পল বয়টন রবার-নির্মিত পোশাক পরে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছিলেন বলে এবং ঐ রবার নির্মিত পোশাক তাঁকে স্বাভাবিকভাবে ভেসে থাকতে সাহায্য করেছিল বলে বয়টনের ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার দাবী গ্রাহ্য হয় না।

যাই হোক, পল বয়টনের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই সাঁতারের পোশাকে ইংলিশ চ্যানেল পার হবার জন্যে নেমে পড়েন ম্যাথু ওয়েব। ১৮৭৫ সালের ১৩ই মে সন্তরণ সুরু হয়। ওয়েব তখন ২৭ বছরের যুবক। বুকভরা দীর্ঘ দিনের সুপ্ত আশা নিয়ে জলে নামলেও হঠাৎ অসময়ে অকস্মাৎ এমন ঠাণ্ডা পড়ে যে, সাত ঘণ্টার বেশী আর তিনি ইংলিশ চ্যানেলের বরফ-গলা জলের সঙ্গে সংগ্রাম করতে সমর্থ হন না। এই পরাজয়ে বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ হন না তিনি। তিন মাস ধরে নিজেকে তৈরী করে আবার তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন ২৪শে আগস্ট তারিখে। সামুদ্রিক 'জেলির' দংশনে দংশনে তাঁর স্কন্ধদেশ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। ঢেউয়ের উপর ঢেউ এসে তাঁর অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। তবুও অচল, অটলভাবে এগিয়ে চলেন তিনি। এইভাবে ২১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ধরে দুর্জয় সঙ্কল্পে অটুট থেকে ম্যাথু ওয়েব এসে পৌছান ফ্রান্সের উপকূলবর্তী 'কেপ গ্রিজ নেজে।'

ম্যাথুর এই অকল্পনীয় অসম্ভব সাফল্যের সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইংলণ্ডে উৎসবের সমারোহ পড়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে

তাঁর সম্বর্ধনা-সভায় যোগদান করা হয়ে পড়ে ইংলণ্ডের জনসাধারণের অন্যতম দৈনন্দিন কর্মসূচী। শহরে, পল্লীতে সকল গৃহে তাঁকে অভিনন্দন জানানোর সে কি আকুল প্রার্থনা! ওয়েব সাফল্যলাভ করবার পর যেদিন প্রথম গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন সেদিন মশাল হাতে এগিয়ে আসে অগণিত জনতা সেই বিজয়ী বীরকে গৃহে বরণ করে নিতে। ডোভারের এক বিরাট সভায় 'নব ইতিহাসের অন্যতম স্রষ্টা' হিসাবে নাগরিক সম্মান লাভ করেন তিনি। উপহার, উপঢৌকন, অর্থ অযাচিতভাবে বর্ষিত হতে থাকে তাঁর উপর। ম্যাথু ওয়েব ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করবার পর থেকে ৩৬ বছর পর্যন্ত অন্য কোন সাঁতারু চ্যানেল অতিক্রম করে তাঁর এই গৌরবের অংশীদার হবার সুযোগ লাভ করেননি।

এই সাফল্যের পর প্রচুর অর্থাগম হতে থাকায় অধিকতর অর্থের মোহে তিনি পেশাদারী বৃত্তি গ্রহণ করেন। বিভিন্নরূপ সন্তরণ, ক্রমাগত সন্তরণের নানান কৌশল তিনি দেখিয়ে বেড়াতে থাকেন ইউরোপ ও আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। আমেরিকায় পৌঁছুবার পর পল বয়টন তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেন এক ২৫ মাইল দূরপাল্লার সাঁতারে। যে বিজয়ী হবে সে ১,০০০ ডলার পুরস্কার পাবে স্থির হয়। সাঁতারের নির্দিষ্ট দিনে বয়টন এসে হাজির হন এক অদ্ভুত পোশাক পরে। ঐ পোশাক এমনভাবে তৈরী ছিল যাতে মানুষকে স্বাভাবিকভাবে জলের উপর ভাসিয়ে রাখে। শুধু তাই নয়, ঐ পোশাকের সঙ্গে আবার এমনভাবে এক জোড়া 'প্যাডেল' লাগানো ছিল যাতে ঐ প্যাডেলটি হাত দিয়ে ঘোরালেই সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। ওয়েব নিজের শক্তির দম্ভে তখন এমন উন্মাদ যে বয়টনের ঐ জাতীয় পোশাক দেখেও তিনি কোন আপত্তি করেন না। সাঁতার সুরু হতেই ম্যাথু ওয়েব এগিয়ে যান প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনেক পেছনে ফেলে। পাঁচ মাইল পর্যন্ত তাঁর এই অগ্রগমনের গতি ব্যাহত হয় না। তিন ঘণ্টা এইভাবে সাঁতার কাটবার

পর অসম্ভব শীতে তাঁর মাংসপেশীগুলি সঙ্কুচিত হতে থাকে। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জল থেকে তিনি উঠে পড়তে বাধ্য হন। ,বয়টন ২৫ মাইল পথ অতিক্রম করে ১,০০০ ডলার পুরস্কার লাভ করেন। এর পর আমেরিকার জনসাধারণ ম্যাথু ওয়েবকে অহরহ ব্যঙ্গ করে তাঁর জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। নিজের সুনামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তিনি নতুন কিছু অসম্ভবকে সম্ভব করবার কল্পনায় এগিয়ে যান।

উত্তর আমেরিকায় ইরী ও অণ্টারিও নামে বৃহৎ হ্রদ দুটির বিশাল বারিধি ১৬০ ফুট উঁচু থেকে যেখানে উন্মাদের মত আছড়িয়ে পড়ছে সেইখানেই সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম জলপ্রপাত 'নায়েগারা'। ১৬০ ফুট উঁচু থেকে আছড়িয়ে পড়ে আহত জলরাশি আক্রোশে উন্মাদ হয়ে শত ফণা বিস্তার করে সম্মুখের দিকে প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে চলেছে। দুর্বার তার গতি, ভীষণ তার গর্জন। ১৮৮৩ সালে ওয়েব ঘোষণা করেন যে তিনি নায়েগারা জলপ্রপাতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক মাইল সাঁতার কেটে তীরে উঠে আসবেন। তাঁর কয়েকজন হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ এই অবাস্তব কল্পনাকে ত্যাগ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ম্যাথুর মুখে এক কথা—

'আমি মহা বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত'

যেদিন সন্তরণে অসম্ভব বলে কিছু থাকবে না। যে কোন তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি—তার গতিবেগ যতই তীব্র থেকে তীব্রতর হোক না কেন, ঘূর্ণায়মান জলরাশি যত বিক্রমেই লুক্কায়িত শিলাস্তূপে আঘাত করুক না কেন, সাময়িক হলেও মানুষ নিজের শক্তিতে নিশ্চয়ই তাকে উপেক্ষা করতে পারবে। আমি মানুষের সেই অপরিমিত শক্তিকে প্রমাণ করবো পৃথিবীর বুকে। মানুষের মনে সাহস যোগাবো যুগে যুগে—অজেয়কে জয় করবার, অসম্ভবকে সম্ভব করবার।

১৮৮৩ সালের ২৪শে আগস্ট লক্ষাধিক দর্শকের সম্মুখে ওয়েব

ঝাঁপিয়ে পড়েন 'নায়েগারার' উত্তাল তাণ্ডবের মাঝে। ভাসমান তৃণ-খণ্ডের মত সেই উন্মত্ত জলরাশির মাঝে কোথায় মিলিয়ে যায় তাঁর ছোট্ট দেহ কেউ আর তা দেখতে পায় না। কয়েক দিন পর সেই স্থান থেকে বহু দূরে খুঁজে পাওয়া যায় ক্ষতবিক্ষত বিবর্ণ, বিকৃত সন্তরণের সেই উন্মাদ পূজারীর মৃতদেহ। জলের বুকে নিজের বুক রেখে চিরশান্তি মহাশান্তিতে নিমগ্ন।

ম্যাথু ওয়েবের এই উন্মাদ প্রচেষ্টাকে ইতিহাস যে আখ্যাই দিক না কেন, তিনি যে দূরপাল্লার সাঁতারের পথিকৃৎ, সন্তরণে অজেয়কে জয় করবার, অসম্ভবকে সম্ভব করবার মনোবল, সাহস ও শক্তি তিনি মানুষকে যে যুগে যুগে দিয়ে আসছেন—একথা সর্বদেশের সকল মানুষই শ্রদ্ধানতচিত্তে স্বীকার করবে।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় ফেরেঙ্ক পুসকাস

## ফেরেঙ্ক পুসকাস

হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের ফুটবলে বিশ্বজয়ী হাঙ্গেরীর অধিনায়ক ফেরেঙ্ক পুসকাস তাঁর আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে মুখবন্ধে বলেছেন, "এ আমার আত্মজীবনী নয়—আমার জীবন অপেক্ষা প্রিয় ফুটবল খেলার প্রণয়-কাহিনী। আমার ঘরের দেওয়ালের চারিদিকে অসংখ্য পুরস্কার, ছবি, বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্ট, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার স্মারক-পুস্তিকা আমার প্রণয়-কাহিনীর উজ্জ্বল স্মৃতি বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় —আমাকে পার্থিব জগৎ থেকে বহু দূরে কোন্ এক স্বপ্নপুরীতে নিয়ে যায়। 'গোল' বলে যে ছোট্ট কথাটি ফুটবলে প্রচলিত আছে, আমি ঐ শব্দের মাঝেই শুনতে পাই সঙ্গীতের সুললিত ধ্বনি। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কুয়াসাচ্ছন্ন ও বৃষ্টিভেজা হ্যাম্পডেন পার্কে স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক খেলার ছবি। ভেসে ওঠে ওয়েম্বলিতে হাঙ্গেরীর প্রথম গোল দেবার পর দূরাগত প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের শব্দের মত দর্শকদের উচ্চকলরোল 'গোল'—'গোল'। আমি অনুভব করি প্রখর রৌদ্রতাপ ও গ্রীষ্মে জর্জরিত মেক্সিকোর খেলার সুখস্মৃতি। শুনতে পাই—বুদাপেস্টের জনাকীর্ণ স্টেডিয়ামের বিজয়-উল্লাস। আমার স্মৃতিপটে আরও ভেসে ওঠে ছোট্ট একটি ছেলে মায়ের ছেঁড়া মোজা দিয়ে বল তৈরী করে খেলতে খেলতে চীৎকার করে উঠেছে— তার মুখে ঐ সুমধুর শব্দ 'গোল'। হঠাৎ বাঁশির তীব্র স্বরে সচকিত হয়ে উঠি। তাকিয়ে দেখি খেলা সুরু হচ্ছে। নিজেকে আবার তৈরী করি ঐ 'গোল' 'গোল' কথাটি শোনবার জন্য—অনেককে শোনাবার জন্য।"

ফুটবল খেলাকে পুসকাস যেমন ভালবেসেছেন তেমনি আবার এই খেলাই তাঁকে এনে দিয়েছে জগৎজোড়া সম্মান। আজ বিশ্বে বোধ হয় এমন ফুটবল-রসিক কমই আছেন, যাঁর মনে পুসকাস নামটি শোনবার সঙ্গে সঙ্গে শিহরণ জাগে না। যাঁরা তাঁর খেলা দেখেছেন

তাঁরা তো বটেই, এমনকি সেই খেলার বিবরণ পড়বার বা শোনবার যাঁরা সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাও অন্তর থেকে অভিনন্দিত করেছেন ফুটবলের এই কুশলী শিল্পীকে। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের বিজয়ী ফুটবলদলের অধিনায়ক হিসাবে তাঁর খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েনি, নিজের অপরূপ খেলার মাধ্যমেই তিনি আজ অনুপম—অবিস্মরণীয়। ১৯৫০ সাল থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুটবল দলগুলিকে বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত করে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে তাঁর অপরাজিত যোদ্ধৃদল নিয়ে। অস্ট্রিয়া, ইটালী, যুগোশ্লাভিয়া, রাশিয়া, ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ব্রেজিল, উরুগুয়ে—সকল দেশেই নিজ দেশের ফুটবলের বিজয়কেতন উড়িয়েছেন তিনি। দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর সুনাম। অগণিত দর্শক, সমর্থক, খেলোয়াড় তাঁর খেলার চারুসুষমায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেছে। তাই বর্তমানে ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে পুসকাসের স্থান সকলের পুরোভাগে, সকলের অন্তরের অন্তস্তলে।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি মিস্টার এ্যাভেরি ব্রাণ্ডেজ বলেছেন, "হাঙ্গেরীর ধর্ম হলো খেলাধুলা।" মাত্র নয় লক্ষ লোক অধ্যুষিত হাঙ্গেরী ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ১৬টি স্বর্ণপদক এবং বিজয়ীর ক্রম-পর্যায়ের তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করে ব্রাণ্ডেজের কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত করেছে। খেলাধুলায় উন্নত সেই হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্টে ১৯২৬ সালে পুসকাস জন্মগ্রহণ করেন। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে তিনি ওকসি নামে পরিচিত।

বুদাপেস্ট থেকে কয়েক মাইল দূরে কিসপেস্টে পুসকাসের বাল্য-জীবন কাটে। অতি শৈশব থেকে ফুটবল খেলার মধ্যে তিনি পেতেন অনাবিল আনন্দ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেলার মাঝেই তাঁর দিন কেটে যেতো। ড্রেক, জ্যামারা, বুচান প্রভৃতি হাঙ্গেরীর তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের নামে নিজেদের নামকরণ করে যখন তাঁরা

খেলা সুরু করতেন, তখন গোচারণের তৃণাচ্ছাদিত মাঠে ছেঁড়া কম্বল ও নেকড়ার বল নিয়ে যে তাঁরা খেলছেন একথা কখনো মনে আসতো না তাঁদের। প্রত্যেক শনিবার ও রবিবারে কিসপেস্টে যে পেশাদারী ফুটবল খেলা হতো সে খেলা যেমন করে হোক দেখা চাই পুসকাসের। কিন্তু খেলা দেখার পয়সা কোথায় ? তাই গাছের মাথায় চড়ে, খেলার মাঠের পাশের কবরখানায় উঠে বা 'গেটকিপারের' পায়ের ফাঁক দিয়ে চট করে গলে গিয়ে মাঠে ঢোকা ছাড়া আর উপায় ছিল না। মাঝে মাঝে তাঁর বা দলের অন্য কারো কান দুটো যখন গেটকিপারের হাতে ধরা পড়তো, তখন কোনরকমে সেই কান দুটোকে ছাড়িয়ে নিয়ে চোঁ করে ঢুকে পড়তেন একেবারে মাঠের মধ্যে। একদিন টিকিট কেটে মাঠে ঢোকার ইচ্ছা হওয়ায় এক কসাই-এর বিড়াল চুরি ক'রে এবং সেই বিড়াল বিক্রি ক'রে তবে পয়সার যোগাড় করতে হয়। এইভাবে খেলা দেখার নানা অসুবিধা হতে থাকায় শেষে দলবল নিয়ে পুসকাস এক গুপ্ত গর্ত খুঁড়ে ফেলেন কবরখানা থেকে একেবারে মাঠের পাঁচিলের তলা পর্যন্ত। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এই পথেই পুসকাস দলবল নিয়ে মাঠে এসে খেলা দেখেন।

১৯৩৬ সালে একদিন পুসকাস ও তাঁর দলবল যখন নেকড়ার বল নিয়ে খেলায় ভীষণ ব্যস্ত, সেই সময়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে সত্যকারের ফুটবল খেলতে তাঁরা ইচ্ছুক কি না জানতে চান। সকলে সমস্বরে সম্মতি জানানোতে সেই ভদ্রলোক তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে যান ফুটবল ষ্টেডিয়ামে। যে ঘরে খেলোয়াড়দের বুট থাকে সেই ঘরটি খুলে দিয়ে বলেন, "তোমরা তোমাদের খুশি মত বুট পরে নাও।" অতি দরিদ্র কোন লোককে যদি সোনা, রূপা বোঝাই ঘরে ছেড়ে দিয়ে বলা যায়, তোমার যা খুশি নিয়ে নাও, তাহলে সেই লোকটির যে অবস্থা হয়—পুসকাস ও তাঁর সঙ্গীদের হলো ঠিক তাই। বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁরা ঐ বুটগুলির মাঝে।

কাড়াকাড়ি চলতে থাকে কে কোন্‌টি পরবে বলে। কিন্তু সব বুটই বড় মাপের। সেই বড় বুট পরে খপর খপর করতে করতে নেমে পড়েন তাঁরা মাঠে। যতই জোরে তাঁরা বল মারতে চেষ্টা করুন না কেন, পাতুটোই শুধু সামনে পেছনে করতে থাকে বুটের মধ্যে—বলে আর জোর হয় না। জোরে দৌড়াবারও উপায় নেই—পা বার হয়ে আসে। কিছুক্ষণ ঐভাবে খেলা চলবার পর যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সকলে যখন বসে পড়েন মাঠে তখন সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক ধীরে ধীরে কাছে এসে পরিচয় দেন—"আমি কিসপেস্ট ক্লাবের ফুটবল শিক্ষক। আমার নাম ন্যাণ্ডর জাকস্‌। যদি আন্তরিকতার সঙ্গে খেলা শিখতে চাও তোমরা, তাহলে আমি তোমাদের সকল বিষয়ে সাহায্য করবো। বল, বুট, মাঠ বা খেলার কোন সরঞ্জামের কখনো তোমাদের অভাব হবে না। তুদিন পর আবার তোমরা এসো।" এই কথা কটি বলে ঐ বৃদ্ধ চলে যান। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের বহু আগেই পুসকাস ও তাঁর সঙ্গীদের মাঠে দেখা যায়। সময় মত এসে হাজির হন ন্যাণ্ডর জাকস্‌। সকলের পায়ের কাছে ঠিক ঠিক মাপের এক জোড়া বুট ফেলে দেন তিনি। একটা নতুন আনকোরা চকচকে বলও এনে দেন। নতুন বুট, নতুন বল, বড়দের মাঠে খেলবার সুযোগ, পৃথিবীর যে কোন ঐশ্বর্য ও সুখের চেয়ে সেদিন বেশী আকর্ষণীয় ও আনন্দময় ছিল পুসকাস ও তাঁর সঙ্গীদের কাছে।

পুসকাসের পিতা হাঙ্গেরীর একজন শুধু প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ই ছিলেন না—তাঁর শিক্ষা দেবার কৌশল এত অপূর্ব ছিল যে কিসপেস্ট ক্লাবের ফুটবল শিক্ষক হিসাবেও তিনি মনোনীত হন। পিতার বড় আশা যে তাঁর সন্তান যেন একদিন ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে দেশবিদেশে সম্মান লাভ করে। তাই সারাদিন খেলার পর পুসকাস যখন কাদামাটি মেখে বা জামা কাপড় ছিঁড়ে বাড়িতে এসে ঢুকতেন তখন পিতা শুধু মায়ের প্রহার থেকে ছেলেকে রক্ষা করতেন না—বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় হতে হলে যতরকমের শিক্ষার প্রয়োজন

তার কোন শিক্ষা দিতেই কার্পণ্য করতেন না তিনি। হাঁটুতে বা পায়ে আঘাত লাগলে নিজ হাতে ছেলেকে মালিশ করে দিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দিতেন কি করে নিজের পা বাঁচিয়ে খেলতে হয়। সব সময় উৎসাহিত করতেন ছেলেকে। বলতেন, "প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় হতে হলে যা কিছু গুণাবলীর প্রয়োজন তার সবকিছুই নিহিত আছে তোমার মধ্যে।"

কিসপেস্ট ক্লাবের প্রধান ফুটবল শিক্ষক ছিলেন বৃদ্ধ ন্যাণ্ডর জাকস্। ইনিই পুসকাসের ফুটবল গুরু। পুসকাসকে সন্তানাধিক স্নেহ করতেন তিনি। ছেলেবেলা থেকেই বন্ধুরা পুসকাসকে 'কিং অব স্কোরার' বা 'গোল দেবার রাজা' বলে ডাকতো। ঐ নামটি শুনতে তাঁর খুব ভালো লাগতো। একদিন অনন্য খেলোয়াড় হব এই ছিল তাঁর একমাত্র বাসনা। তাই যে কোনরূপ কঠোর অনুশীলন তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করতে দ্বিধা করতেন না। ফুটবল অনুশীলন ছাড়াও বাস্কেটবল খেললে দেহের সাবলীল ভঙ্গিমা ও দ্রুত দিক্-পরিবর্তনের শিক্ষা হয় বলে বাস্কেটবলও তিনি নিয়মিত খেলতেন। হাঙ্গেরীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের কোন খেলা দেখবার সুযোগ কখনও নষ্ট করতেন না তিনি। কি করে অন্য সব ধুরন্ধর খেলোয়াড়েরা বল মারছে, অন্যদিকে বল দিচ্ছে, সট করছে, হেড করছে, সে-সব গভীর মনোনিবেশ সহকারে দেখে যেটি তাঁর ভালো লাগতো বাড়িতে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীলন করে তাই আয়ত্ত করতেন। উন্নত ফুটবল খেলা দেখে সব চেয়ে বেশী শিক্ষা লাভ করা যায়, একথা পুসকাস নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বেশী অনুভব করেছেন বলেই বলেছেন—

"In my opinion there can be no more effective training than giving youth the opportunity of seeing as many really good players as possible in first class matches. Watching matches teaches youngsters the methods of the great footballers, their style and their tactics"

১৯৪৩ সালে কিসপেস্ট ক্লাবের বড়দের দলের হয়ে পুসকাস প্রথম খেলবার সুযোগ লাভ করেন। শক্তিশালী 'নেভীগোরড' দলের বিরুদ্ধে এই খেলায় যখন তিনি মাঠে ঢুকতে যান তখন দ্বাররক্ষক এত কমবয়সী খেলোয়াড় কিসপেস্ট দলের মত শক্তিশালী দলে স্থান পেতে পারে না, এই সন্দেহে তাঁকে মাঠে ঢুকতে দিতে অস্বীকার করে। শেষে পুসকাসের পিতা এসে দ্বাররক্ষকের ভুল সংশোধন করে দিয়ে বলেন, "দেখতে এবং বয়সে বালক হলেও ওর খেলা বালকের মত নয়।"

বয়স অত্যন্ত কম থাকায় দলের অন্যান্য অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাল রেখে খেলতে পুসকাসের প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হতো। দলের নিয়মিত খেলোয়াড়দের রুটিন মাফিক অনুশীলনে তাঁর মন ভরতোনা, তাই অনুশীলনের পর একাকী একটি বল নিয়ে নেমে পড়তেন মাঠে। বলটিকে পা দিয়ে মেরে শূন্যে রাখার অনুশীলন করে ক্রমে তিনি ঐ বলটিকে ২০০ বার পর্যন্ত শূন্যে রাখতে পারতেন। মাঠের মাঝে বিভিন্ন বাধার সৃষ্টি করে তিনি বল নিয়ে দৌড়ে ঐ সব বাধাগুলিকে অতিক্রম করার এমন কঠোর অনুশীলন করেন যে শেষে তিনি বলের দিকে না তাকিয়েও অবলীলাক্রমে ঐ বলটিকে পা দিয়ে খেলতে খেলতে মাঠের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারতেন। এর পর চোখ বন্ধ করে মাঠের যে কোন জায়গায় বল সট করে ফেলবার অভ্যাস সুরু করেন পুসকাস। এই অভ্যাসের ফলে যখন যে কোন খেলোয়াড়ের কাছে খুশিমত তিনি নিখুঁতভাবে বলটিকে পৌঁছে দিতে পারতেন। এইভাবে কঠোর অনুশীলন করে বলের সকল ছলা কলা তিনি এমন ভাবে আয়ত্ত করেন যে ফুটবল তাঁর কাছে অনুগত ভৃত্যের মত—ক্রীতদাসের মত হয়ে পড়ে।

১৯৪৫ সালের ২১শে আগস্ট মাত্র ১৮ বছর বয়সে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক খেলায় পুসকাসকে হাঙ্গেরীর জাতীয় দলে গ্রহণ করা হয়। জীবনের এই প্রথম আন্তর্জাতিক খেলায় ১৮ বছরের ঐ যুবকই প্রথম গোল ক'রে জয়লাভের পথ প্রশস্ত করে দেন।

১৯৪৮ সালটি পুসকাসের কাছে নানাভাবে স্মরণীয়। এক সদাহাস্যমুখী সুন্দরী তরুণী তাঁর জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলিকে আরও সুন্দরতর করবার জন্যে প্রেমের রঙীন পাখা বিস্তার করেন। প্রেমের আকুলতা তাঁর সুনামকে যাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ না করে সেই ভয়ে পুসকাস কঠোর অনুশীলন করে ফুটবলকে তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী করে রাখেন।

এই বছর আরও একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। একদিন অনুশীলন করে বাড়ি ফেরবার পথে এক অপরিচিত ভদ্রলোক পুসকাসের হাতে একটি খামে আঁটা চিঠি দিয়ে যান। বাড়িতে এসে ঐ চিঠিটা খোলার পর তাঁর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ে—মুখ হয়ে পড়ে বিবর্ণ, রক্তশূন্য। ঐ চিঠিতে পুসকাসকে ইউরোপের কোন একটি দলের হয়ে তিন বছর খেলবার জন্য পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড নগদ দেওয়া হবে বলে প্রস্তাব করা হয়। একদিকে এই বিরাট অর্থ যা তাঁর সাধারণ অবস্থার পরিবর্তন করে বিত্তশালী ধনী হিসাবে রূপান্তরিত করতে পারে, অন্য-দিকে নিজের দেশ, নিজের দল এবং প্রেমিকার প্রেম তাঁকে উভয়সঙ্কটে উন্মাদ করে তোলে। মানসিক যন্ত্রণার তীব্র তাড়নায় তাঁর খেলা এমন নিকৃষ্ট পর্যায়ে এসে পৌঁছায় যার ফলে তাঁর প্রিয় শিক্ষক এবং দলের অন্যান্য খেলোয়াড়েরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ঐ তরুণীর প্রেমই তাঁকে খেলার জগৎ থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। পিতৃতুল্য শিক্ষক ন্যাণ্ডি তাঁর প্রিয় ছাত্রের এই অধঃপতনে অশ্রুপূর্ণলোচনে পুসকাসকে বুকে টেনে নিয়ে জানতে চান সব কথা। ঘটনাটি জানবার পর ঐ বৃদ্ধ আবেগবিহ্বল কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলেন, "তুমি যদি এই অর্থের জন্য নিজের সুনাম ও তোমার মাতৃভূমি ত্যাগ করতে চাও, আমি তোমায় বাধা দেবো না। কিন্তু পুত্র, অর্থই মানুষের জীবনের সকল সুখ—সকল কাম্যবস্তুকে এনে দিতে পারে না।" বৃদ্ধের চোখ হয়ে ওঠে বাষ্পাকুল, কণ্ঠ হয়ে আসে অবরুদ্ধ।

এরপর পুসকাস যান তাঁর ভাবীপত্নী এলিজাবেথের কাছে।

এলিজাবেথ পুসকাসের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কাতর অনুনয় করে বল্লেন, "তুমি আমায় ছেড়ে চলে যেও না ওকসি। তোমায় ছেড়ে থাকার অভিশাপের সম্মুখীন হতে আমায় বাধ্য করো না তুমি—সে দুর্বিসহ জ্বালা আমি কিছুতেই সইতে পারবো না।" কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন পূর্ণযৌবনা সুন্দরী এলিজাবেথ। তরুণীর তপ্ত অশ্রু রক্তাভ গণ্ড বেয়ে পুসকাসের হাতে এসে পড়ে' তাঁকে বিচলিত করে তোলে। সেই নারীর উষ্ণ স্পর্শ তাঁর মনে শিহরণ জাগায়। প্রেমের কাছে হয় অর্থের পরাজয়। দুজনে ছুটে যান আঙ্কেল ন্যাণ্ডির কাছে। ন্যাণ্ডি আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরেন পুসকাসকে, বলেন—"ওকসি আমি জানি, হাঙ্গেরীর জন্য ফুটবল খেলায় নবইতিহাস সৃষ্টির জন্য তুমি ছাড়তে পারবে না তোমার মাতৃভূমি। হাঙ্গেরীর পতাকা বহন করে নিয়ে যেতে হবে তোমায় হেলসিঙ্কিতে। সেখানে ওড়াতে হবে তোমায় —তোমার দেশের বিজয় পতাকা।"

১৯৫০ সালে এলিজাবেথকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে সংসারযাত্রা সুরু করেন পুসকাস। ১৯৫২ সালে অলিম্পিক যাত্রার ঠিক আগে তাঁর একমাত্র কন্যা এনিকো পুসকাস ও তাঁর স্ত্রীর বুকভরা স্নেহের অংশীদার হয়। সুস্থ সুগঠিত দেহ এবং অনাবিল আনন্দভরা মন নিয়ে তিনি যাত্রা করেন হেলসিঙ্কির পথে। অলিম্পিকের খেলায় হাঙ্গেরী পুসকাসের অধিনায়কত্বে টার্কি, ইটালী ও সুইডেনকে পরাজিত করে ফাইন্যালে উন্নীত হয়। যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে ফাইন্যাল খেলায় ৩৬ মিনিট খেলা চলবার পর পেনাল্টির সুযোগ পেয়েও পুসকাস সেই সুবর্ণসুযোগের সদব্যবহার করতে পারেন না। লজ্জায় ঘৃণায় তিনি এত বেশী সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন যে প্রতিমুহূর্তে তাঁর মনে হতে থাকে যে সমস্ত হাঙ্গেরী তাঁকে ধিক্কার দিচ্ছে—পরিহাস করছে তাঁকে বিশ্বের যেখানে যত ফুটবল খেলোয়াড় আছে, তারা।

কয়েক মুহূর্তের জন্য পুসকাস বিচলিত হয়ে পড়লেও ধীরে ধীরে

নিজের উপর আস্থা ফিরে পান। কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত আমি করবোই, হাঙ্গেরীর ফুটবল দলের অধিনায়ক আমি, দলীয় সুনাম, দেশের সম্মানকে কিছুতেই আমি পদদলিত হতে দেবো না—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অন্তরে উচ্চারণ করে তিনি খেলা সুরু করেন। দ্বিতীয়ার্ধে যুগোশ্লাভ দলের পক্ষে পুসকাসকে আটকে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এক মদমত্ত সিংহ যেন সমস্ত মাঠে বিচরণ করে বেড়াতে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধের ২৬ মিনিট খেলা চলবার পর পুসকাস বিপক্ষ গোলে যে তীব্র সট করেন সেই সট রক্ষা করা তো দূরে থাক, অধিকাংশ দর্শক ও খেলোয়াড়েরাই সেই বলটি গোলের জালে আটকে যাবার আগে পর্যন্ত দেখতে পান না। হাঙ্গেরীর খেলোয়াড়েরা তাদের দলের প্রিয় নেতাকে আলিঙ্গন করে, মুহুর্মুহুঃ চুম্বন করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

অলিম্পিক ফুটবল-খেলা-শেষে বিজয়ী হাঙ্গেরী দলের অধিনায়ক হিসাবে স্বর্ণপদক লাভ করেন পুসকাস। এই সাফল্যের পর নিজের দেশে পুসকাস ও তাঁর সহখেলোয়াড়েরা যে ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা লাভ করেন তা হাঙ্গেরীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এর পর তাঁর অধিনায়কত্বে হাঙ্গেরীর ফুটবল দলের বিজয় অভিযান সুরু হয় দেশে দেশে। অস্ট্রিয়া, ইটালী, সুইডেনের মত শক্তিশালী দলগুলি সেই দুর্জয় দুর্বার আক্রমণের গতি রুদ্ধ করতে পারে না। নিজের দেশের মাটিতে দীর্ঘ ৯০ বছর ধরে অপরাজিত ইংলণ্ড দল বিপর্যস্ত—বিধ্বস্ত হয়। হাঙ্গেরীর ফুটবল খেলার নবতম কৌশল—"the good player keeps playing even without the ball"—প্রমাণিত হয় বিশ্বের দরবারে। ১৯৫৪ সালে ৫৪,০০০ দর্শককে সাক্ষী রেখে ইংলণ্ডের জাতীয় একাদশকে আবার পরাজিত করেন তাঁরা। এই খেলার পর ইংলণ্ড তথা সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবল সমালোচক ডাঃ উইলি মিজেল বলেন,—

"I can truthfully say, that in this match of the century Hungary had forgotten nothing and England

hadn't learnt a thing...Football needs to be played in the Hungarian style." ইংলণ্ডের এই শোচনীয় পরাজয়ে পুনরায় প্রমাণিত হয় যে, আধুনিক ফুটবলে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য থেকে দলগত বোঝাপড়ার প্রয়োজন অনেক বেশী—"The eleven best football players will not make the best football eleven."

এর পর বিশ্বফুটবল প্রতিযোগিতায় হাঙ্গেরী দল পুসকাসের অধিনায়কত্বে যোগদান করে। প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় পশ্চিম জার্মাণীর খেলোয়াড়েরা পুসকাসকে আটকাতে না পেরে মারাত্মক ভাবে আহত করে তাঁকে। পরবর্তী খেলা ব্রেজিলের সঙ্গে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ খেলা। কিন্তু পুসকাসের পক্ষে এই খেলায় যোগদান করা সম্ভব হয় না। দীর্ঘদিন ধরে কঠোর অনুশীলন করে দলের সব থেকে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অধিনায়ক হয়েও নিজ দলকে সাহায্য করতে পারবেন না—এই দুঃখে ও ব্যথায় তিনি শিশুর মত প্রত্যহ রাত্রে কেঁদে কাটাতে থাকেন। যাই হোক, ব্রেজিল পরাজিত হয় কিন্তু খেলা শেষে বেশ পরিবর্তনের ঘরে এসে মারাত্মক ভাবে আহত করে তারা হাঙ্গেরীর অধিকাংশ খেলোয়াড়দের। ফাইন্যালে পশ্চিম জার্মাণীর বিরুদ্ধে খেলায় পুনরায় পুসকাস মাঠে নামলেও নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ পশ্চিম জার্মাণীর কাছে ৩—২ গোলে পরাজিত হন। এই খেলায় ইংলণ্ডের রেফারী মিস্টার লিনজ্ পুসকাসের শেষ মুহূর্তের গোলটি যে কেন অফসাইডের অজুহাতে অগ্রাহ্য করেন তার কারণ আজও পুসকাসের কাছে অজানা রয়েছে। শুধু এইটুকুই তিনি বলেছেন—"টেলিভিসন দর্শক ও মাঠে উপস্থিত দর্শকদের সাক্ষী রেখে আমি বলতে পারি, আমার গোলটি অবসাইড ছিল না।" এই বিপর্যয়ে সাময়িকভাবে পুসকাস ও তাঁর সহ-খেলোয়াড়েরা কিছুটা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেও অপ্রতিহত জয়যাত্রার পথ ধরে হাঙ্গেরীর ফুটবল দল আবার পুসকাসের অধিনায়কত্বে এগিয়ে চলে।

১৯৫৪ সালের শেষাশেষি পর্যন্ত পুসকাস হাঙ্গেরীর হয়ে ৬৫টি আন্তর্জাতিক খেলায় যোগদান করেছেন। তিনি আশা করেন যে ৭৫টি আন্তর্জাতিক খেলায় যোগদান করে ইমেরস্কল্জার হাঙ্গেরীর ফুটবল ইতিহাসে যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন সেই রেকর্ডকে তিনি ম্লান করে দিতে পারবেন। হয়ত এতদিনে সেই অভীপ্সিত পথের শেষ সীমানায় এসে পৌঁছেছেন তিনি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য চিঠি এই প্রশ্ন নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হয় যে, আর কতদিন তিনি তাঁর নয়নাভিরাম খেলার সাহায্যে—দর্শকদের অনাবিল আনন্দ দিতে সক্ষম হবেন। পুসকাস সেই সব অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, আগামী সাত-আট বছর একই ভাবে খেলা খেলতে হয়ত তাঁর পক্ষে কষ্টকর হবে না।

বিবাহিত জীবন খেলাধুলার উন্নতির পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে, পুসকাস একথা বিশ্বাস করেন না। স্ত্রী এলিজাবেথ ও কন্যা এনিকোকে নিয়ে পুসকাসের সুখনীড়। দেশে দেশে তাঁর অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষী শুভানুধ্যায়ী প্রিয়জন। সারা বিশ্ব তাঁর ক্রীড়াভূমি।

## জিম থর্প

সুইডেনের রাজধানী স্টকহলমে পঞ্চম অলিম্পিকের আসর বসেছে ১৯১২ সালে। রাজা গুস্তব নিজে খেলাধুলায় বিশেষ উৎসাহী, তাই রোজ আসেন এই খেলাধুলার আসরে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ্‌দের উন্নত প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখবার জন্য। কিন্তু ডেকাথলন ও পেণ্টাথলন প্রতিযোগিতার পর হঠাৎ তিনি তাঁর নির্দিষ্ট আসন ছেড়ে এ্যাথলেটদের বেশ পরিবর্তনের ঘরের দিকে এগুতে থাকেন। দেহরক্ষী ও অন্যান্য সৈনিকেরা দুধারে লোক সরিয়ে পথ করে দিতে থাকে। পরিচালকমণ্ডলী বিস্মিত নেত্রে চেয়ে থাকেন সেই যাত্রাপথের দিকে। ডেকাথলন ও পেণ্টাথলন প্রতিযোগিতা তখন কেবলমাত্র শেষ হয়েছে। প্রতিযোগীরা কেউ বেশ পরিবর্তন করছে—কেউবা করছে বিশ্রাম। হঠাৎ রাজা গুস্তব দরজা খুলে ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে। অসময়ে ও এই অকল্পনীয় স্থানে রাজার আগমনে সকলে হতবাক্ হয়ে যায়। কিন্তু গুস্তবের সে-সব লক্ষ্য করবার সময় নেই। সকলের মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে দেখছেন—কাকে যেন খুঁজছেন তিনি। হঠাৎ তাঁর নজর পড়ে ঘরের কোণে যেখানে এক যুবক বসে রয়েছে। সুঠাম পেশীবহুল ঋজু তার দেহ। উজ্জ্বল তামার মত রঙের উপর ঘামের শ্বেতবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে। গুস্তব ছুটে যান সেই যুবকের কাছে। ভুলে যান তিনি সুইডেনের রাজা—ভুলে যান নিজের সম্মান ও আভিজাত্যের কথা। দুই হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে সেই যুবককে তিনি বলেন, "হে সম্মানীয় অতিথি, হে বন্ধু, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেট তুমি। যদি অনুগ্রহ করে একবার মাত্র আমার সঙ্গে করমর্দন করো তবে নিজেকে আমি ধন্য মনে করবো।" স্মিতহাস্যে উঠে দাঁড়ায় যুবক। করমর্দন করে আনন্দ-উৎফুল্ল হৃদয়ে সুইডেনের রাজা গুস্তব বেরিয়ে যান ঘর ছেড়ে।

'প্রতিভা এমনই জিনিস যে ইহা যাহা কিছুকে স্পর্শ করে

তাহাকেই সজীব করে'। মানুষের অপরিমিত শক্তি যখন কোন বিশেষ প্রতিভাবান ব্যক্তির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, তখন সেই মানুষ যে ইতিহাস সৃষ্টি করে তা রূপে-রসে হয়ে থাকে অনন্য, চিরউজ্জ্বল, চিরশাশ্বত। খেলাধুলার ইতিহাসে এমন একজন প্রতিভাবান মানুষের নাম পাওয়া যায় যার প্রতিভা মানুষকে বার বার এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একজন মানুষের পক্ষে খেলাধুলার নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। মানুষকে যুগে যুগে এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করার দৃষ্টান্ত যিনি স্থাপন করে গেছেন তিনি হলেন জিম থর্প।

বিশ্বের খেলাধুলার শ্রেষ্ঠ আসর অলিম্পিকের সর্বাপেক্ষা কঠিনতম প্রতিযোগিতা দুটির নাম হলো **'ডেকাথলন'** ও **'পেণ্টাথলন'**। ১০০ মিটার, ৪০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার দৌড়; ১১০ মিটার হার্ডলস, হাইজাম্প, সটপাট, বর্শা ছোড়া, পোলভল্ট, ব্রডজাম্প এবং ডিসকাস ছোড়া—এই ১০টি প্রতিযোগিতা ডেকাথলনের অন্তর্ভুক্ত। পেণ্টাথলন বলতে ব্রডজাম্প, বর্শা ছোড়া, ডিসকাস ছোড়া, ২০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার দৌড়—এই পাঁচটি প্রতিযোগিতাকে বুঝায়। ঐ ১০টি ও ৫টি প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করে যিনি সর্বাধিক বেশী পয়েণ্ট লাভ করেন, তিনিই বিজয়ীর সম্মানে ভূষিত হন। এ্যাথলেটিকসের সকল বিভাগে চরম উৎকর্ষতা লাভ না করলে ডেকাথলন ও পেণ্টাথলনে জয়লাভ করা অসম্ভব।

অলিম্পিকের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত জিম থর্প ছাড়া অন্য কোন এ্যাথলেটই ডেকাথলন ও পেণ্টাথলন উভয় বিভাগেই বিজয়ীর গৌরব লাভ করতে পারেন নি। ১৯১২ সালে সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সৃষ্টি করেন তিনি। কিন্তু অলিম্পিকের ইতিহাসের পাতায় আজ আর সেই অবিশ্বাস্য ইতিহাসের স্রষ্টার নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবহেলিত রেড ইণ্ডিয়ান বংশোদ্ভূত থর্প ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে পরবর্তীকালে বিজয়ীর সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। অলিম্পিক প্রতি-

যোগিতায় যোগদানের আগে পেশাদারী বেস্‌বল খেলায় যোগদান করেছেন বলে তাঁর নাম বিজয়ীর তালিকা থেকে মুছে দেওয়া হয়— তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় বিজয়ীর স্বর্ণপদক। অলিম্পিকের কঠোর আইনে আজ বিজয়ীর তালিকায় থর্পের নাম লিখিত নেই সত্য। প্রমাণ হিসাবে বিজয়ীর স্বর্ণপদকও তাঁর কাছে নেই। কিন্তু তবুও থর্প বিশ্বের ক্রীড়ারসিকদের মনে যে ছবি এঁকে গেছেন—তা 'তুচ্ছ করি রাজ্য ভাঙ্গা গড়া' যুগে যুগে মানুষকে তাঁর কথা স্মরণ করতে বাধ্য করবে। বাধ্য হবে সকল দেশের সকল মানুষ কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ঘোষণা করতে যে তিনিই এ্যাথলেটিকসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এ্যাথলেট। অবশ্য, শুধু এ্যাথলেটিকসের কথা বললে থর্পের প্রতিভাকে ছোট করা হয়। বেস্‌বল ও রাগবী খেলায় আমেরিকায় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান তিনি লাভ করে গেছেন। বন্দুক ছোঁড়া, স্কেটিং, টেনিস, হকি এবং ল্যাক্রোসি খেলাতেও অসংখ্য পুরস্কার তিনি প্রতি বছর ঘরে এনে তুলেছেন।

জিম থর্পের পিতার নাম ছিল হিরাম থর্প। থর্পের মায়ের নাম ছিল চার্লেট ভিউ থর্প। ১৮৮৮ সালে ২৮শে মে থর্প প্রাগের নিকটবর্তী এক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে ঐ স্থানটি ওকলাহোমার অন্তর্গত। মাত্র তিন বছর বয়স থেকেই জিম ঘোড়ার পিঠে উঠতেন এবং অতি শৈশব অবস্থা থেকেই সাঁতার দিতে পারতেন। মাত্র ১০ বছর যখন তাঁর বয়স তখন তিনি একটা হরিণ শিকার করেন। 'স্যাক-ফক্স রিসার্ভেসন স্কুলে' তাঁর প্রথম শিক্ষা সুরু হয়। ঐ স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি 'হাস্কেল ইনস্টিটিউটে' পরবর্তী পাঠ্যজীবন আরম্ভ করেন। পেনিসেলভিনিয়ার 'কারলিসিল ইণ্ডিয়ান স্কুলে' তাঁর পাঠ্যজীবন শেষ হয়।

কারলিসিল স্কুলের ছাত্র অবস্থায় থর্পের এ্যাথলেটিকস প্রতিভা প্রথম ধরা পড়ে স্কুলের খেলাধুলার শিক্ষক গ্লেন এল. ওয়ার্ণারের কাছে ১৯০৭ সালে। ঘটনাটি ছিল এই,—একদিন স্কুলের ছেলেরা

হাইজাম্পের অনুশীলন করছে। এক জায়গায় এসে বার বার চেষ্টা করেও কিছুতেই কেউ আর সে বাধাটি অতিক্রম করতে পারছে না। জিম দূরে বসে কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখে শেষে বিরক্ত হয়ে জামা-জুতো-পরা অবস্থায় হঠাৎ দৌড়ে এসে অবলীলাক্রমে ঐ বাধাটি পার হয়ে যান। জিমের এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে ওয়ার্ণার সেইদিনই বুঝতে পারেন যে উপযুক্ত শিক্ষা পেলে একদিন এই বালক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারবে। ক্রমেই থর্পের প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। এক বছর ব্যবধানে নিকটবর্তী আর একটি স্কুল-দলের বিরুদ্ধে এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় একাকী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে নিজ স্কুল-দলকে বিজয়ীর সম্মান এনে দিয়ে তিনি তাঁর অবিস্মরণীয় প্রতিভার প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

থর্পের প্রতিভা ছিল বিভিন্নমুখী—খরস্রোতা বিরাট নদীর মত। যেদিকে যখনই প্রবাহিত হতে চেয়েছে সেইদিকেই দুকূল প্লাবিত করে সকল বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে আপন ইচ্ছায় তা এগিয়ে গিয়েছে। তাই ১৯০৯ সালে ছাত্র অবস্থাতেই 'উইনস্টন সালেস', 'ফয়েটেভিল' ও 'রকিমাউণ্টের' মত শক্তিশালী পেশাদারী বেস্‌বল দলে যাকে গ্রহণ করা হয়, দুবছর ব্যবধানে তাঁকেই আবার রাগবী খেলায় আমেরিকার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান দিতে জনসাধারণ বাধ্য হয়। শুধু কি তাই, তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তি শুধু এ্যাথলেটিকস, বেস্‌বল ও রাগবী খেলার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি—বন্দুকছোঁড়া, স্কেটিং, টেনিস, হকি, সাঁতার ও ল্যাক্রেসী খেলাতেও সমসাময়িক কালে আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবেও তাঁর নাম লিখিত হয়েছে।

আমেরিকার প্রায় সকল খেলাধুলার একচ্ছত্র সম্রাটের সিংহাসন লাভ করে সারাবিশ্বকে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভায় বিস্মিত করবার জন্যে ১৯১২ সালে তিনি হাজির হন স্টকহলমের পঞ্চম অলিম্পিকে। এই বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে তাঁর অবিস্মরণীয় প্রতিভার স্বাক্ষর থাকে ডেকাথলন

ও পেণ্টাথলনে বিজয়ীর গৌরবের মাঝে। অলিম্পিকের ইতিহাসে আজও যে সম্মান—যে গৌরব কোনও দ্বিতীয় মানুষের পক্ষে করায়ত্ত করা সম্ভব হয়নি। অযাচিত উপহার, উপঢৌকন বর্ষিত হতে থাকে তাঁর উপর। সুইডেনের রাজা গুস্তব শুধু তাঁকে বেশপরিবর্তনের ঘরে ঢুকে অভিনন্দিত করেই ক্ষান্ত হন না—বহু মূল্যবান মণিমাণিক্য-খচিত একটি সুদৃশ্য জাহাজ-আকৃতি পুরস্কার তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেট বলে থর্পকে সম্বোধন করেন।

থর্প এই সাফল্যে সারা বিশ্ববাসীর অভিনন্দন লাভ করলেও তাঁর স্বদেশবাসী অনেকের মনে হিংসার সৃষ্টি হয়। আমেরিকার এ্যাথলেটিক ইউনিয়নের কাছে সেই মাৎসর্যপরায়ণ লোকেরা অভিযোগ উপস্থিত করেন থর্পের নামে—থর্প নাকি অলিম্পিক প্রতিযোগিতার আগে পেশাদারী বেসবল খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। থর্পের কাছে যখন কৈফিয়ত তলব হয় তখন সেই খেলাধুলার নিষ্ঠাবান আদর্শ পূজারী সত্যকে বিন্দুমাত্র বিকৃত না করে উত্তর দেন—"হ্যাঁ, আমি অন্যান্য সহপাঠী ছাত্রদের সঙ্গে ঐ খেলায় যোগদান করেছিলাম—কিন্তু যে ছাত্রেরা সেদিন আমার সঙ্গে মাঠে খেলেছিলেন তাঁরা সকলেই শৌখিন খেলোয়াড় হিসাবে পরিচিত ছিলেন।...আমি তখন একজন অনভিজ্ঞ স্কুলের ছাত্র ছিলাম এবং আন্তর্জাতিক খেলাধুলার বা অলিম্পিকের আইন-কানুন কোন কিছুই জানবার সুযোগ আমার ছিল না।" কিন্তু আমেরিকার এ্যাথলেটিক ইউনিয়ন যাঁরা তাঁকে শৌখিন খেলোয়াড়ের তকমা দিয়ে স্টকহলমে পাঠিয়েছিলেন তাঁরা সন্তুষ্ট হন না এই সরল সত্য ভাষণে। ১৯১৩ সালের জানুয়ারী মাসের শেষাশেষি থর্পের নাম মুছে দেওয়া হয় অলিম্পিক বিজয়ীর তালিকা থেকে। নিরলস সাধনা ও বহু কষ্টে অর্জিত সেই স্বর্ণপদক দুটি তাঁর কাছ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এমন কি, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী সুইডেনের এইচ উইসলেণ্ডারকে সেই পদকই পুনরায় উপহার দেওয়া হয় বিজয়ী বলে।

১৯১৩ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকার শ্রেষ্ঠ পেশাদারী বেসবল খেলোয়াড় হিসাবে অজস্র অর্থ তিনি উপার্জন করেন। এর পর বেসবল খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করে রাগবী খেলার সংগঠনের কাজে ব্রতী হয়ে তিনি রাগবী এসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি হবার গৌরব লাভ করেন। অবশ্য, ১৯২০ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত আমেরিকার শ্রেষ্ঠ রাগবী দল 'নিউ ইয়র্ক জায়ণ্টসের' তিনিই ছিলেন প্রধান স্তম্ভ। ১৯২৯ সালে রাগবী খেলাতেও প্রভূত অর্থ উপার্জন করে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

খেলাধুলার জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে অভিনেতা হিসাবে থর্প যথেষ্ট সুনামের অধিকারী হন। তাঁর নিজের জীবনী অবলম্বনে মেট্রো গোল্ডুইন মেয়ার 'ব্রোঞ্জ ম্যান' নামে যে ছবি তোলেন, পৃথিবীর সকল দেশেরই অসংখ্য জনসাধারণ অধীর আগ্রহভরে সেই ছবি দেখে আনন্দ লাভ করেন। রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে এবং বিভিন্ন খেলাধুলার উপদেষ্টা হিসাবেও কিছুদিন তাঁর অতিবাহিত হয়। ১৯৩৭ সালে তিনি পুনরায় ওকলাহোমাতে ফিরে এসে রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন। ১৯৪০ সালে খেলাধুলার একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হিসাবে আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে খেলাধুলার উপকারিতার কথা, খেলাধুলায় উন্নতি লাভের উপায়, খেলাধুলার সঙ্গে শিক্ষা, সভ্যতা ও কৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে থাকেন। ১৯৪৩ সালে ওকলাহোমার আইন-সভায় দুই জন রেড-ইণ্ডিয়ান সদস্যের অনুরোধে ওকলাহোমার আইন-সভা আমেরিকার এ্যাথলেটিক ইউনিয়নের কাছে থর্পের অলিম্পিক রেকর্ড স্বীকার করে নেবার জন্য অনুরোধ করেন। অন্য একজন রেড ইণ্ডিয়ান সদস্য থর্পকে কোন বিখ্যাত কলেজে শরীর-শিক্ষার উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করবার জন্যেও এক প্রস্তাব করেন। কিন্তু কোন প্রস্তাবই গ্রাহ্য হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরু থেকে আমেরিকার স্থল ও নৌবাহিনীতে তিনি কাজ আরম্ভ করেন।

৫ ফুট ১১½ ইঞ্চি লম্বা সোনালী চুল ও পিঙ্গলবর্ণ চোখ বিশিষ্ট জিম থর্প ১৯১৩ সালে ইভা মিলার, ১৯২৬ সালে ফ্রিডা প্যাট্রিক এবং ১৯৪৫ সালে প্যাট্রিকা গ্লাডিস এসকিউকে বিবাহ করেন। তিনটি পত্নীর স্বামী ও অনেকগুলি পুত্র-কন্যার পিতা থর্পের জীবনের শেষ কয়েক বছর বড়ই করুণ ও বিষাদময়। অজস্র অর্থ উপার্জন করা সত্ত্বেও অভাবের তাড়নায় শেষ বয়সে তিনি অর্থকষ্টে দিনপাত করেন। ৬৪ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর রাজপথের পাশে একঘরওয়ালা ট্রেলার গাড়ির মধ্যে পাওয়া যায় তার বিবর্ণ মৃতদেহ।

অলিম্পিকে থর্পের সাফল্যের তালিকা নিচে দেওয়া হলো ঃ—

## পেণ্টাথলন ঃ—

ব্রড জাম্প—প্রথম—দূরত্ব ২৩ ফিট ২ ৭/১০ ইঞ্চি

ডিসকাস ছোঁড়া—প্রথম—দূরত্ব ১১৬ ফিট ৮·৪ ইঞ্চি

বর্শা ছোঁড়া—তৃতীয়—দূরত্ব ১৫৩ ফিট ২½ ৯/১০ ইঞ্চি

২০০ মিটার দৌড়—প্রথম—সময় ২২·৯ সেঃ

১৫০০ মিটার দৌড়—প্রথম—সময় ৪ মিঃ ৪৪ ৪/৫ সেঃ।

## ডেকাথলন ঃ—

১৫০০ মিটার দৌড়—প্রথম—সময় ৪ মিঃ ৪০ ১/১০ সেঃ

১১০ মিটার হার্ডলস—প্রথম—সময় ১৫ ৬/১০ সেঃ

হাই জাম্প— প্রথম—উচ্চতা ৬ ফিট ১/৬ ইঃ

সট পাট—প্রথম—দূরত্ব ৪২ ফিট ৫·৩ ইঃ

১০০ মিটার দৌড়—তৃতীয়—সময় ১১ ১/৫ সেঃ

ডিসকাস ছোঁড়া—তৃতীয়—দূরত্ব ১২১ ফিঃ ৩·৯ ইঃ

পোল ভল্ট—তৃতীয়—উচ্চতা ১০ ফিঃ ৮ ইঃ

ব্রড জাম্প—তৃতীয়—দূরত্ব ২২ ফিঃ ৫·৩ ইঃ

বর্শা ছোঁড়া—চতুর্থ—দূরত্ব ১৪৯ ফিঃ ১১·২ ইঃ

৪০০ মিটার দৌড়—চতুর্থ—সময় ৫২ ১/৫ সেঃ।

মোট পয়েন্ট—৮,৪১২·৯৬।
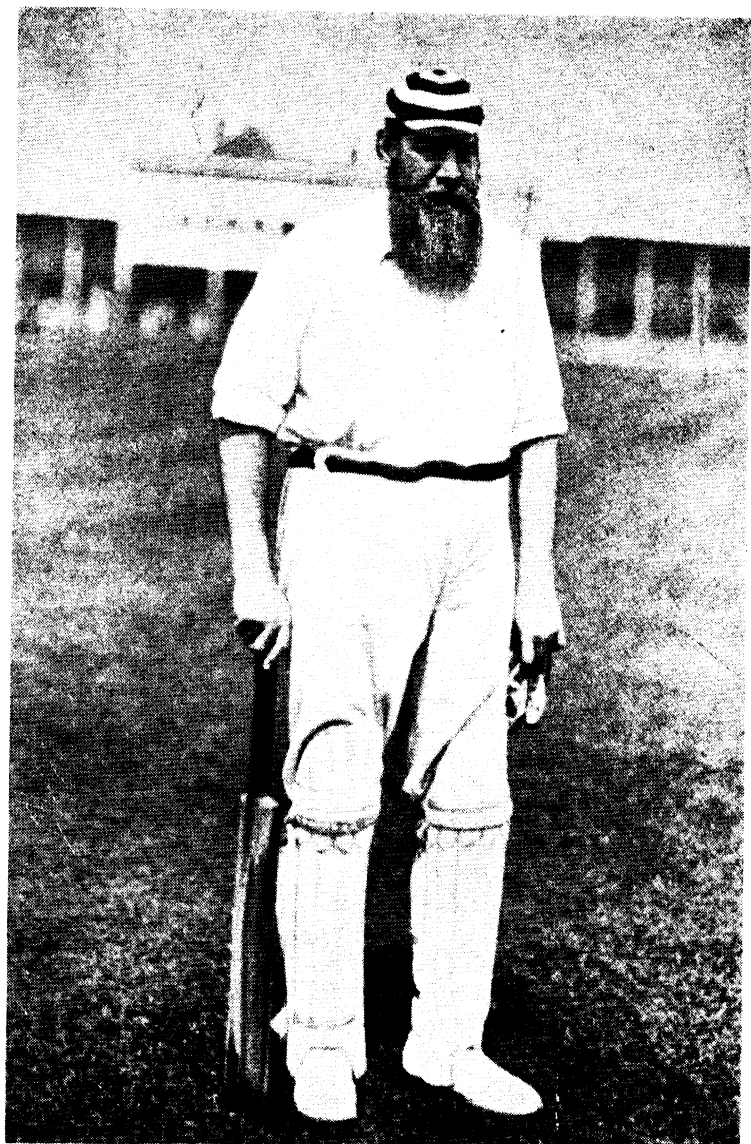
ইংলণ্ড ক্রিকেটের নবযুগের স্রষ্টা ডব্লিউ জি গ্রেস

## ডব্লিউ জি গ্রেস

যখন ক্রিকেট খেলা ইংলণ্ডের মুষ্টিমেয় জনসাধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেই সময়ে ক্রিকেটের যে বিরাট প্রতিভা খেলার চারুসুষমায় আবালবৃদ্ধবনিতাকে মুগ্ধ করে, সেই খেলার আকর্ষণ লর্ডস মাঠ থেকে সুরু করে নিভৃত পল্লীর ছায়াবীথি ঘেরা কুটিরে পৌঁছে দিয়েছিলেন—তিনি হলেন ডব্লিউ জি গ্রেস। ইংলণ্ডের ক্রিকেট ইতিহাসের নবযুগের প্রবর্ত্তক তিনি—তিনিই ক্রিকেটের প্রাণস্পন্দনের দ্যোতক। খেলার যা কিছু কলানৈপুণ্য—যা কিছু সৌন্দর্য—যা কিছু দর্শনীয় তার সবকিছুরই অধিকারী ছিলেন গ্রেস। তাই ক্রিকেট খেলার তিনি অনন্যপ্রতিভা—সুন্দরের, আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তিনি যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ছিলেন একথা হয়ত আজ প্রমাণ করা শক্ত। আবার তিনি যে কোন কালের কোন শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান থেকে কোন অংশে নিকৃষ্ট একথাও আজ প্রমাণ করা একইভাবে দুঃসাধ্য। দীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে যে খেলোয়াড় একের পর এক সেঞ্চুরী করে যেতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই সাধারণ পর্যায়ের খেলোয়াড় নন। ৪৭ বছর বয়সে যে খেলোয়াড় মাত্র এক মাসের মধ্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দলগুলির বিরুদ্ধে সহস্র রাণ করবার কৃতিত্ব লাভ করতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্য প্রতিভা ও অপূর্ব জীবনীশক্তির অধিকারী।

ক্রিকেট খেলায় যখন বোলারদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত, সেই সময়ে যে ধুরন্ধর খেলোয়াড় বোলারদের একচ্ছত্র অধিকারের বিরুদ্ধে প্রথম মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন—সেই আক্রমণধারাকে উপেক্ষা ও অবহেলা করে নিজের খুশিমত রাণ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তিনি হলেন ডব্লিউ জি. গ্রেস। প্রথম শ্রেণীর খেলায় ১২৬টি সেঞ্চুরী ও মোট ৫৪,৮৯৬ রাণ সেই অমর প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

কিন্তু শুধুমাত্র ব্যাটসম্যান হিসাবেই তাঁর পরিচয় নয়—বোলিং ও ফিল্ডিং-এ তাঁর সাফল্য সমভাবে স্মরণীয়। যে খেলোয়াড় যে ধরনের বলে খেলতে অপটু তার বিরুদ্ধে ঠিক সেই জাতীয় বল করে ২,৮৭৬টি উইকেট (গড়পড়তা ১৭'৯২ রাণে) লাভ করে গেছেন তিনি। কত ব্যাটসম্যান তাঁর নিখুঁত বল ধরা ও অব্যর্থ বল ছোঁড়ার কৌশলে ব্যাট করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

ব্যাটসম্যান, বোলার, ফিল্ডার ছাড়াও গ্রেস ছিলেন মনেপ্রাণে খেলোয়াড়। কোনদিন কোন মুহূর্তের জন্য খেলায় কোন বিচারের বিরুদ্ধে তাঁকে কখনো কেউ অভিযোগ করতে শোনেনি। কেউ দেখেনি তাঁকে কখনো ক্রিকেট খেলার কোন আইনকে কোন দিন অবজ্ঞা বা লঙ্ঘন করতে। খেলোয়াড়োচিত মনোভাব তাঁর শুধুমাত্র খেলার মাঠেই প্রকাশিত হতোনা—দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যহিক কাজের মাঝেও মূর্ত হয়ে উঠতো সেই খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের নিখুঁত ছবি।

১৮৪৮ সালের ১৮ই জুলাই উইলিয়াম গিলবার্ট গ্রেস পৃথিবীর প্রথম আলো দেখবার সুযোগ লাভ করেন। বাড়িতে তাঁর নাম ছিল গিলবার্ট। পিতা ছিলেন হেনরী মিলস্। একজন ধর্মভীরু ডাক্তার। দরিদ্রের সেবাতেই তাঁর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হতো। ক্রিকেট খেলার উপর মিলসের আগ্রহ ও উৎসাহের সীমা ছিল না। তিনি নিজেও একজন দক্ষ খেলোয়াড় ছিলেন। গ্লসেস্টার কাউন্টি ক্রিকেট দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেও তিনি স্মরণীয়। গ্রেসের মায়ের নাম ছিল মার্থা পোকক্। গ্রেসের রক্তে ক্রিকেট খেলার নেশা ধরিয়েছিলেন এই জননী।

ছেলেবেলা থেকেই গ্রেস ক্রিকেট খেলার প্রতি আকৃষ্ট হন। নিজেদের ফুলবাগানের অসমতল রাস্তার উপর ছোট ব্যাট হাতে করে দাঁড়াতেন তিনি, আর বল ছুঁড়ে দিতো পরিচারিকা। ক্রমেই এই খেলার উপর তাঁর আকর্ষণ বাড়তে থাকে। যে করে হোক,

তাঁর প্রতিদিন ক্রিকেট খেলা চাই-ই। হয়ত কোনদিন উইকেট খুঁজে পাওয়া যায়নি, কিংবা বল করবার লোক যোগাড় হয়নি। কি আসে যায় তাতে। দেওয়ালের গায়ে খড়ি দিয়ে উইকেট এঁকে ব্যাট হাতে করে দাঁড়িয়েছেন গিলবার্ট। আস্তাবলের সহিসদের ডাক পড়েছে বা পাড়ার দু'চারটে ছেলে এসে জুটেছে। চলেছে খেলা।

শান্তির সংসার ছিল তাঁদের। রাজনৈতিক আবহাওয়া বা যুদ্ধের উন্মত্ততা কখনও কোনো ছায়া ফেলতে পারেনি তাঁদের সংসারের মাঝে। পিতার অপরিসীম উৎসাহ ক্রিকেট খেলায়। গ্রেস ও তাঁর বড় ভাই যখন একটু বড় হয়েছেন তখন পিতা নিজ হাতে সোজা ব্যাট ধরে খেলা শেখালেন ছেলেদের। বাড়ির ফুলবাগানের সুদৃশ্য ফুলগাছগুলি উপড়ে তুলে ফেলে তৈরী হলো ক্রিকেট পিচ—ছেলেদের অনুশীলনের সুবিধার জন্য। মার্চ মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত পিতার শিক্ষায় নিয়মিত ভাইবোনদের মিলিত খেলা চলতো ঐ ক্রিকেট পিচে। প্রয়োজন হলে বাড়ির চাকর-বাকর পর্যন্ত এসে যোগ দিতো।

মাত্র ৯ বছর বয়সে গ্রেস প্রথম ক্রিকেট ম্যাচ খেলবার সুযোগ লাভ করেন। পিতার নেতৃত্বে পশ্চিম গ্লসেস্টার শায়ারের বিরুদ্ধে এই খেলায় মাত্র ৩ রাণ করলেও এই বালককে আউট করা বিপক্ষের বোলারদের পক্ষে সেদিন সম্ভব হয় না। এই সময় তাঁর বড় ভাই এডওয়ার্ড মিলস গ্রেসের ( ইংলণ্ডের ক্রিকেট ইতিহাসে 'ই. এম' নামে যিনি বিখ্যাত ) নাম ছড়িয়ে পড়ে দেশ-বিদেশে। কিন্তু গ্রেস প্রথম তিন বছর ১৯ ইনিংস খেলে মাত্র ২২ রাণ সংগ্রহ করায় তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই নিরাশ হন। মায়ের তীব্র ভর্ৎসনা তাঁর নিত্য প্রাপ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিভাবান ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সংসারে এমন একজন অ-খেলোয়াড়ের সৃষ্টি হওয়ায় আত্মীয়-পরিজন সকলেই যার-পর-নাই দুঃখিত হন। ভালো ফিল্ডিং করার জন্য গ্রেসের পিতা মাঝে মাঝে লোক কম হলে তবুও তাঁকে দলে নিতে থাকেন।

১৮৬০ খৃস্টাব্দে মাত্র ১২ বছর বয়সে ক্লিফটনের বিরুদ্ধে ৫০ রাণ করেন তিনি। বাড়ির সকলের মনে আবার তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নূতন আশার দোলা লাগে। কিন্তু পরবর্তী তিন বছর সেই ব্যর্থতার পুরানো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। সংসারের সকলেই তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকল আশাই ছেড়ে দেন।

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে—'Morning shows the day.' গ্রেসের জীবনে এই প্রবাদটি কিন্তু প্রযোজ্য নয়। পৃথিবীতে কত অদ্ভুত জিনিসও তো সম্ভব হয়। লেখাপড়ায় যে ছেলে বাল্যজীবনে সকলকে হতাশ করেছে সেই ছেলেই পরবর্তী জীবনে বিশ্বের বিদ্বজ্জন-সভায় স্থান লাভ করেছে, এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। প্রকৃতির খেয়ালে উর্বর প্রান্তরের মাঝে নদীর স্বচ্ছ ধারা সৃষ্টির কথা বা ধরিত্রীর বুকে পর্বতের মাথা লুকানোর কথাও তো শোনা যায়। ১৮৬৩ সালে গ্রেস কঠিন নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকার পর যখন তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন তখন তাঁর দেহে আসে এক অদ্ভুত পরিবর্তন। ক্ষীণকায় গ্রেস হয়ে পড়েন বিরাটকায়, বলশালী পুরুষ। এই বছরের প্রথম খেলায় অল্পের জন্য তিনি শত রাণে বঞ্চিত হলেও বছর-শেষে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ দলগুলির বিরুদ্ধে প্রতি ইনিংসে তাঁর রাণের গড়পড়তা দাঁড়ায় ২৬ রাণ। ইংলণ্ডের ক্রিকেট-আকাশে নতুন সূর্য উদয়ের বার্তা ঘোষিত হয়।

তখনকার দিনে শত রাণ আজকের মত সহজলভ্য ছিল না। বোলাররা ছিলেন ব্যাটসম্যান থেকে অনেক বেশী পারদর্শী। তাই যাঁরা সে সময়ে শত রাণ করবার গৌরব লাভ করতেন তাঁরা পেতেন অকুণ্ঠ অভিনন্দন। বড় ভাই 'ই. এম' এম. সি. সি-র হয়ে কেণ্টের বিরুদ্ধে ১৯২ রাণ করে যখন ঘরে ঘরে অভিনন্দন কুড়িয়ে বেড়াতে থাকেন সেই সময় থেকেই গ্রেসের মনে বড় ভাই থেকে আরও বড় হবার সাধ জাগে।

সন্তানের প্রতিভা প্রথম ধরা পড়ে মায়ের চোখে। ইংলণ্ডের অধিনায়ক জর্জ পার হঠাৎ একদিন একখানি চিঠি পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে যান। সেই চিঠির ভাষা ছিল "আমার বড় ছেলে 'ই. এম' আজ একজন দক্ষ ও কুশলী খেলোয়াড়। ইংলণ্ড দলে নিয়মিত স্থানলাভ করলে দেশের সুনামকে নিঃসন্দেহে সে বাড়িয়ে তুলতে পারবে বলে আমি আশা করি। কিন্তু আমার আরও একটি ছোট ছেলে আছে, যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি আরও বেশী আশা রাখি। তার 'ব্যাক প্লে' সত্যই অপূর্ব।"

এই চিঠির ফলেই হ'ক বা অন্য কারণেই হ'ক, মাত্র ১৬ বছর বয়সে গ্রেসকে 'প্লেয়ার'দের বিরুদ্ধে 'জেন্টলম্যান' দলে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই সময়ে পেশাদারী খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত প্লেয়ার দল এত বেশী শক্তিশালী ছিল যে জেন্টলম্যান দল ১৫।১৬ জন ফিল্ডিং করে, উইকেট ছোট করে, এমন কি প্লেয়ার দল থেকে ৩।৪ জন খেলোয়াড় নিজেদের দলে নিয়েও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরাজিত হতো। ১৮০৬ সাল থেকে ১৮৬৫ সালের মধ্যে ৬০ বছরের প্রতিযোগিতায় মাত্র ১৪ বার জেন্টলম্যানদের সাফল্য সেই ইতিহাসের সাক্ষ্য। কিন্তু ১৮৬৫ সাল থেকে সেই পুরাতন ইতিহাসের পরিবর্তন হতে দেখা যায়। একাধারে ব্যাটসম্যান, বোলার ও ফিল্ডার গ্রেস পেশাদারী খেলোয়াড়দের বিজয় অভিযানের বিরুদ্ধে স্তম্ভস্বরূপ হয়ে দাঁড়ান। বিজয়লক্ষ্মী পেশাদারী দল থেকে জেন্টলম্যান দলে স্থান পরিবর্তন করেন। ১৮৬৫ সাল থেকে ১৮৮৩ সালের মধ্যে ৪১ বারের খেলায় জেন্টলম্যান দল ২৯ বার বিজয়-গৌরবে ভূষিত হয়। গ্রেসের অপূর্ব ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং-এর ফলেই জেন্টলম্যান দলের এই সাফল্য সম্ভব হয়।

লর্ডস মাঠের সবুজ মকমলের মত ঘাসের উপর শক্তিশালী এম. সি. সি দলের বিরুদ্ধে প্রথম খেলতে নেমে তরুণ গ্রেস যেদিন ৫০ রাণ করেন সেইদিনই তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চাশা প্রকাশ করা

হয়। ১৮৬৬ সালে চারবার সেঞ্চুরী ও একবার ডবল সেঞ্চুরী করেন তিনি। দু'বছর ব্যবধানে একটি খেলায় দু'বার সেঞ্চুরী করে শৌখিন খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বপ্রথম এই কৃতিত্বের তিনি অধিকারী হন। ১৮৬৯ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে গিলবার্ট গ্রেসকে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। গ্রেসের রক্ষণব্যূহ ভেদ করে উইকেট লাভ করা ক্রমেই বোলারদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁকে ব্যাট হাতে করে ফিরে যেতে দেখা যায় ক্যাচ আউট হয়ে। গ্রেস একটি খেলায় দুইশত রাণ করবার পর উইকেটরক্ষক দুঃখ করে বলেন যে, মাত্র তিনবার বল ধরবার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ বোলার জে. সি. স' যিনি সর্বাপেক্ষা বেশী ২০ বার গ্রেসের উইকেটে বল লাগাতে পেরেছেন, তিনি গ্রেসের অপূর্ব ও অবিস্মরণীয় ব্যাটিং করবার কৌশল সম্বন্ধে বলেছেন—

"I put the ball where I please, and Mr. Grace puts it where he pleases."

১৮৭৩ সালে মেরিলীবোর্ণ ক্রিকেট ক্লাবের অনুরোধে গ্রেস একটি দল নিয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে যান। এই সফরে ব্যাটিং-এর গড়পড়তায় তাঁর নামই শীর্ষস্থানে থাকে। ১৮৭৮ সালে ১১ই ও ১২ই আগস্ট কেণ্টারবেরী মাঠে গ্লসেস্টারশায়ারের হয়ে কেণ্টের বিরুদ্ধে ৩৪৪ রাণ করে ব্যক্তিগত রাণ সংখ্যার যে রেকর্ড তিনি সৃষ্টি করেন, তা শুধু সমসাময়িককালের নয়, সকল দিনের সকল খেলোয়াড়দের কাছেই অবিস্মরণীয় প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হবে। এই ঐতিহাসিক খেলার একদিন পরে নটসের বিরুদ্ধে ১৭৭ রাণ করতে দেখা যায় গ্রেসকে। খেলার পরে তিনি যাত্রা করেন শেফিল্ডে, ইয়র্ক-সায়ারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য। ৩১৮ রাণে অপরাজিত থেকে যখন তিনি প্যাভেলিয়ানে ফিরে আসেন তখন তাঁর রাণ-সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৩৯—মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে যা তিনি সংগ্রহ

করেছেন। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। কিছুদিনের ব্যবধানে তিনি 'গ্রিমস বি' দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামেন। ২২ জন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত ছিল প্রত্যেকটি দল। বিপক্ষের খেলোয়াড়েরা একের-পর-এক সকলে বল করেন গ্রেসকে আউট করবার জন্য। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে গ্রেসের রাণ এগিয়ে যায় ঝড়ের গতিতে। বাতাসে দুলতে থাকে তাঁর মুখের লম্বা দাড়ি—দুলে ওঠে হাতের ব্যাট আর সেই ব্যাট থেকে বল তীরবেগে ছুটে যায় মাঠের বাইরে। ২২ জন খেলোয়াড়ের ৪৪ খানি হাত প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেই বলের গতি রুদ্ধ করতে পারে না। একে একে সকল খেলোয়াড় আউট হয়ে যান কিন্তু সেই চির-কিশোর গ্রেস হাসিমুখে অবিচল থাকেন উইকেটে। খেলা-শেষে ব্যাট হাত যখন তিনি ফিরে আসেন তখন তাঁর কাঁধে ঝুলছে ৪০০ রাণের ঝুলি। দর্শক, সমর্থক, সমালোচক, খেলোয়াড় সকলেই যে যার আসন থেকে উঠে দাঁড়ায়, সকলের মুখ থেকে একটি কথাই প্রতিধ্বনিত হয়, 'তুমি ক্রিকেট খেলার অতিমানব।'

মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই সময়ে ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা। রাণীর সুশাসনে সকলেই সুখী। রাজ্যের যে কোন প্রতিভার স্বীকৃতি পায় রাণীর দরবারে। কিন্তু ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলায় নবযুগের প্রবর্তন যিনি করেন—প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করেন যিনি, সেই অমর প্রতিভার তো কোন মর্যাদা পায় না রাণীর কাছে। বিভিন্ন পত্রিকায় দিনের পর দিন এই নিয়ে সমালোচনা হয়। 'পাঞ্চে' লেখা হয়—

"Oft have I seen that cricketer or this
Bat bowl, or field or Catch ( or even miss )
And oft, astounded by some piece of play,
Have marked with letters red the auspicious
day."......

কিন্তু ব্যর্থ হয় জনগণের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা। কোন পদবী যুক্ত হয় না গ্রেসের নামের সঙ্গে। গ্রেস—ডবলিউ জি. গ্রেসই থেকে যান মৃত্যু পর্যন্ত।

১৮৭৯ সালে ৩১ বছর বয়সে এডিনবরা থেকে এল. আর. সি. পি. এবং ডারহাম থেকে এফ. আর. সি. এস. উপাধি লাভ করেন তিনি। ডাক্তারী পরীক্ষায় এই সাফল্যের পর ইংলণ্ডের সমর্থকেরা গ্রেসকে ৪০ গিনির একটি ঘড়ি, সঙ্গে ১,৪৫৮ পাউণ্ডের একখানি চেক উপহার দেন। দাতাদের নামের তালিকায় প্রিন্স অফ ওয়েলস (পরবর্তী এডওয়ার্ড দি সেভেন)-এর নামও দেখা যায়। চারটি সন্তানের পিতা হওয়ার পরও যে কোন খেলায় শতরাণ করা ছিল যেন গ্রেসের ইচ্ছাধীন। তাঁর অনুপম খেলার জন্যই গ্লসেস্টার দল ১৮৭০ সাল থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে ৭ বার কাউন্টি খেলায় প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হয়। ১৮৯৫ সালে ৪৭ বছর বয়সে যখন তাঁর দেহে বার্ধক্য আসতে সুরু করেছে সেই সময়ে এক মাসের মধ্যে সহস্র রাণ করে ইংলণ্ডের ক্রিকেট ইতিহাসে আর এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন তিনি। ৫১ বছর বয়সেও তাঁকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন টেস্ট খেলায় তিনি দুইবার শতরাণ করবার কৃতিত্ব লাভ করেন এবং তাঁর রাণের গড়পড়তা ছিল ৩২·৩৯ রাণ।

১৮৯৩ সালে গ্রেস তাঁর খেলাধুলার জীবনে এক চরম আঘাত পান। পিতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও তাঁর সাফল্যের সাহায্যে পরিচিত সেই বহু-স্মৃতি-বিজড়িত গ্লসেস্টার দলের অধিনায়ক পদ ত্যাগ করতে তাঁকে বাধ্য করা হয়। এমন কি, ঐ দলের সঙ্গে তাঁর সকল সম্পর্কের অবসান ঘটে। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি 'লণ্ডন কাউন্টি' নামে একটি নতুন দল গঠন করেন, গ্লসেস্টার দলের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ১৫০ রাণে বিপক্ষের ৬টি উইকেট দখল করেন।

গ্রেসের জীবনের সর্বশেষ খেলা ১৯১৪ সালের ২৫শে জুলাই।

৬৭ বছর তখন তাঁর বয়স। বার্ধক্য এসেছে সারা দেহে কিন্তু তখনও তিনি অতুলনীয় অপরাজিত। ৬৯ রাণ করে ফিরে এলেন তিনি আউট না হয়ে। মাত্র ৯ বছর বয়সে জীবনের প্রথম খেলায় অপরাজিত থাকার যে হাতে খড়ি তাঁর হয়, যৌবনের বহু গৌরবদীপ্ত খেলার মাঝে তিনি সেই শিক্ষার সাক্ষ্য রেখে যান। বার্ধক্যে খেলা থেকে বিদায়ের শেষ মুহূর্তেও তিনি নির্ভুলভাবে অনুসরণ করতে সমর্থ হন তাঁর জীবনের প্রথম পাঠ। তাই ইতিহাস তাঁকে আদরে বুকে টেনে নেয়। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের তালিকায় স্থান পায় তাঁর নাম।

গ্রেসের জীবনের অধিকাংশ ভাগ ক্রিকেট খেলার মধ্যে কাটলেও মাঝে মাঝে তাঁকে গল্‌ফ খেলতে, শিকার করতে অথবা ছিপ নিয়ে কোন হ্রদ বা নদীর ধারে চুপ করে বসে থাকতে দেখা গেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বক্তা হিসাবেও তাঁর সুনাম কিছু কম ছিল না। কেন তিনি ধূমপান করেন না, একথা বন্ধু-বান্ধবেরা যদি কেউ কখনো ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করতেন, তিনি তাঁর লম্বা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলতেন —"শেষে কি এই মহীরুহে দাবানলের সৃষ্টি করবো।"

১৯১৫ সালের ২৩শে অক্টোবর ৬৭ বছর বয়সে ডবলিউ জি. গ্রেস নিজেকে বিশ্বের ক্রিকেট রসিকদের মনের মণিকোঠায় চিরজীবী রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। ইংলণ্ডের জনসাধারণ ক্রিকেট খেলায় যে কোন আলোচনা হলে আজও যাঁদের উপমা দেন তাঁরা হলেন 'গ্রেস-ট্রায়ো।' ইংলণ্ডের বিখ্যাত পত্রিকা 'ক্রিকেট ও ফুটবল জার্নালে' লেখা সুললিত ছন্দের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বিশেষভাবে স্মরণ করেন তাঁরা গ্রেসের অমর প্রতিভা—

"In history's volumes his famous renown,
The fame of the Gráce brothers three—
May Time immemorial serve as a crown
To honour great W. G."

শ্রেষ্ঠ হেভিওয়েট মুষ্টিক জো লুই

# জো লুই

কালের কোন্ এক অখ্যাত যুগে মুষ্টিযুদ্ধ প্রথম সুরু হয়েছিল তার কোন সঠিক ইতিহাস আজও লিখিত হয়নি। কিন্তু বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধারা যে যুগে যুগে রাজকীয় সম্মান থেকে সুরু করে জনসাধারণের অকুণ্ঠ সম্বর্ধনা লাভ করে এসেছেন, তার প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় আছে। অর্থ, খ্যাতি ও যশ তাঁরা একই সঙ্গে লাভ করেছেন। এই সব স্মরণীয় মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে অবিস্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, তিনি হচ্ছেন আমেরিকার নিগ্রো বীর জো লুই। জো লুইস ব্যারো তাঁর আসল নাম। 'ব্রাউন বম্বার' নামেও তিনি পরিচিত।

১৯১৪ সালের ১৩ই মে এলাবামার লাফায়েটের কাছে এক অশিক্ষিত কৃষি পরিবারে জো লুই জন্মগ্রহণ করেন। লুই যখন খুব ছোট তখন তাঁর মা তাঁদের সবক'টি ভাইবোনদের নিয়ে মিচিগানের অন্তর্গত ডেট্রয়টে চলে আসতে বাধ্য হন। বাল্যকাল থেকেই জো লুইয়ের দেহে অপরিমিত শক্তি ছিল। এত সুন্দর ও সুগঠিত ছিল তাঁর দেহ যে তাঁকে গ্রীক দেবতার সঙ্গে তুলনা করা হতো। জীবনে লেখাপড়া করবার সুযোগ তাঁর বিশেষ হয়নি। লেখাপড়া না শিখলেও জো লুই অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক ছিলেন। অসাধারণ শক্তির অধিকারী হলেও তাঁর মন ছিল অত্যন্ত কোমল ও দয়াপ্রবণ। তাই অনেক সময় দেখা যেতো তাঁকে দুঃস্থ রোগীদের পাশে। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হৈ-চৈ করার চেয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে খেলা করতেই তিনি বেশী ভালবাসতেন। সাধারণ পোশাকে ও সাধারণ আহারের মাঝেই তাঁর ছিল তৃপ্তি। যে কোন শক্তির সাধনায় সংযম ও চরিত্রের দৃঢ়তা একান্ত প্রয়োজন—এ শিক্ষা শৈশবেই তিনি লাভ করেছিলেন। বাল্যকাল থেকেই ধর্মের 'উপর তাঁর ঝোঁক ছিল। মুষ্টিযুদ্ধের সাধক হলেও ফুটবল ও গল্‌ফ খেলাতেও লুই-এর সুনাম

কম ছিল না। অবসর সময়ে গান-বাজনা করে তিনি প্রচুর আনন্দ পেতেন।

বাল্যকাল থেকেই জো লুই-এর মুষ্টিযুদ্ধের উপর তীব্র আকর্ষণ দেখা যায়। বিভিন্ন খেলাধুলা বিশেষ করে মুষ্টিযুদ্ধের প্রচলন তখন ডেট্রয়টে খুব বেশী থাকায় লুই-এর মুষ্টিযোদ্ধা হবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বাড়তে থাকে। বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে নিজেকে পরিচিত করবার জন্যে নিয়মিত কঠোর অনুশীলন তিনি সুরু করেন। আন্তরিক সাধনা ছাড়া যে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করা যায় না, এ শিক্ষা অশিক্ষিত লুই নিজ থেকেই লাভ করেছিলেন। শৌখিন মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে ডেট্রয়টের জনসাধারণের কাছে তাঁর নাম আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

১৯৩৩ সালে লুই প্রথম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। এমেচার এ্যাথলেটিক ইউনিয়ন পরিচালিত আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় লাইট হেভি ওয়েটে প্রথম অবতীর্ণ হয়ে তিনি সেমি-ফাইন্যালে ম্যাক্স মারেকের কাছে পরাজিত হন। এ পরাজয়ে সাময়িক ব্যথা পেলেও তিনি নিরাশ হন না। নিজের শক্তির উপর এত দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ছিল যে মারেকের কাছে পরাজয়ের পরেই বন্ধু-বান্ধবদের কাছে তিনি বলেছিলেন, আগামী বছর এই পরাজয়ের প্রতিশোধ তুলে আমি বিজয়ী হবোই। সেই অঙ্গীকার তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৪ সালে বোস্টনে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় লাইট হেভি ওয়েটে যে মুষ্টিযোদ্ধা একে একে সকলকে পরাজিত করে বিজয়ী বলে ঘোষিত হন, তিনি হলেন জো লুই। এই সময় থেকেই লুই-এর নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সালে দুই বছরের মধ্যে লুই ৫৪টি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে ৪৩টি লড়াইয়ে নকআউটে ও ৭টি লড়াইয়ে পয়েন্টে বিজয়ী হন। মাত্র ৪টি ক্ষেত্রে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

১৯৩৪ সালে ৪ঠা জুলাই জো লুই পেশাদারী বৃত্তি গ্রহণ করেন।

১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তাঁর জয়যাত্রা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। এই দীর্ঘ ৬ বছরের বিজয়-অভিযানের মধ্যে মোট ৪০টি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে ৩৯টি প্রতিযোগিতায় তিনি বিজয়ী হন। এই সাফল্যের পর বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে জো লুইকে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

বিশ্ববিজয়ী খেতাব লাভ করবার জন্যে এর পর তাঁর কঠোর সংগ্রাম স্থরু হয়। ইটালীর বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা কারনেরা তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা। যেমন বিরাট তাঁর দেহ তেমনি অটুট তাঁর স্বাস্থ্য। অভিজ্ঞ কারনেরার বিরুদ্ধে জো লুই যখন প্রথম অবতীর্ণ হন তখন লুই নিশ্চিত পরাজিত হবেন, এই ধারণাই অধিকাংশ লোকের বদ্ধমূল হয়। কিন্তু এই নিগ্রো যুবক তাঁর ক্ষিপ্র ও তীব্র মুষ্ট্যাঘাতের ফলে মাত্র ৬ষ্ঠ রাউণ্ডেই কারনেরাকে ভূতলশায়ী করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেন। দ্বিতীয় মুষ্টিযুদ্ধে তাঁকে অবতীর্ণ হতে হয় ম্যাক্সবেয়ারের সঙ্গে। ১৯৩৫ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর ৪র্থ রাউণ্ডেই রক্তাপ্লুত মুখে ম্যাক্সবেয়ার পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হন।

পৃথিবীর এই দুই শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধাকে সহজেই পরাজিত ক'রে এবং আরও কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করবার পর লুই অন্যান্য মুষ্টিযোদ্ধাদের শক্তিকে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করতে থাকেন। নিজের শক্তির গর্বে তিনি নিয়মিত অনুশীলন করা পর্যন্ত ত্যাগ করেন। ফলে, ১৯৩৬ সালে ১৯শে জুন ম্যাক্সমেলিং-এর সঙ্গে ১২ রাউণ্ড পর্যন্ত লড়বার পর তিনি নকআউটে পরাজিত হন। লুই-এর পেশাদারী জীবনে এই সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ পরাজয়। এই পরাজয় লুইয়ের জীবনে হয়ত প্রয়োজন ছিল এবং এই পরাজয়ের শিক্ষাই তাঁকে ভবিষ্যতে অজেয় মুষ্টিযোদ্ধার খ্যাতিলাভে সাহায্য করেছিলো। বিপক্ষকে সহজভাবে গ্রহণ করে লড়াই করতে অথবা নিয়মিত অনুশীলন ছাড়া কোন লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে ভবিষ্যতে আর কেউ কখনো তাঁকে দেখেনি।

১৯৩৩ সালে ১৭ই আগস্ট জ্যাক সার্কিকে তৃতীয় রাউণ্ডে পরাজিত করবার পর তিনি সমসাময়িক বিখ্যাত ৬ জন মুষ্টিযোদ্ধাকে মোট ১৫ রাউণ্ডের মধ্যে পরাজিত করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। এই ৬ জনের মধ্যে একমাত্র বব প্যাস্টর ছাড়া অন্য কোন মুষ্টিযোদ্ধা তিন রাউণ্ডের বেশী লুই-এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হন না।

১৯৩৭ সালে ২২শে জুন জো লুই-এর জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। বহু আকাঙ্ক্ষিত ও বহু প্রতীক্ষিত বিশ্ববিজয়ীর সম্মান এই শুভ দিনে তাঁর করায়ত্ত হয়। এই বিখ্যাত লড়াই হয় ব্রাডকক ও লুই-এর মধ্যে। ব্রাডকক এই সময়ে ছিলেন হেভিওয়েট বিভাগে বিশ্ববিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা। বিজয়ীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে ব্রাডকক সুরু থেকেই তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করে লড়াই আরম্ভ করেন। কিন্তু জো তখন জয়লাভের নেশায় উন্মাদ। বিপক্ষের আক্রমণ সুকৌশলে প্রতিহত করে মুহূর্তমাত্র সুযোগ পেলেই লুই শিকারী নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকেন ব্রাডককের উপর। তীব্র ও ক্ষিপ্র সেই আক্রমণ অমিতশক্তিসম্পন্ন এক একটি মুষ্ট্যাঘাত ব্রাডককে বিচলিত করে তোলে। ব্রাডকক অবসাদ অনুভব করতে থাকেন। অন্যদিকে জো-র আক্রমণ হয় তীব্র থেকে তীব্রতর। ডান হাত বাঁ-হাত যে হাতে যখনই সুযোগ পাচ্ছেন সেই হাতে ভীষণতম আঘাত হানছেন। ব্রাডককের পা টলতে থাকে। চোখের সামনে অন্ধকারের কালো পর্দা নেমে আসতে থাকে। অষ্টম রাউণ্ডে তাঁর দেহ লুটিয়ে পড়ে। বিশ্ববিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে জো লুই-এর নাম ঘোষণা করা হয়। মাত্র ২৩ বছর বয়সে সর্বকনিষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে তিনি এই সম্মান লাভ করে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

মুষ্টিযুদ্ধে বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেও সুখী হতে পারেন না জো লুই। ম্যাক্সমেলিং-এর কাছে ১৯৩৬ সালের দুঃসহ গ্লানি তাঁকে দিবারাত্র যন্ত্রণা দিতে থাকে। নিজেকে তিনি তৈরী করতে থাকেন। আরও দুর্জয়—আরও দুর্বার আক্রমণের কৌশল নিয়মিত অনুশীলন

করতে থাকেন। জীবনের কলঙ্কময় ইতিহাস থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য তিনি যেদিন সেই জার্মাণ মুষ্টিযোদ্ধা ম্যাক্সমেলিং-এর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন, সেদিন লুই-এর চেহারা দেখে দর্শকেরা শিউরে ওঠেন। সমস্ত চোখে মুখে এক হিংস্র দুর্বার আক্রমণের অভিব্যক্তি—শিরায় শিরায় রক্তের তাণ্ডব—পেশীগুলি যেন আক্রোশে ফুলছে। লড়াই সুরু হতেই জো ঝাঁপিয়ে পড়েন বাঘের মত। ভয়াবহ ভীষণতম এক একটি মুষ্ট্যাঘাত জার্মাণ মুষ্টিযোদ্ধার চোখে মুখে পড়তে থাকে আর তিনি যন্ত্রণায় শিশুর মত চীৎকার করে উঠতে থাকেন। কিন্তু রেহাই নেই—আক্রমণের পর আক্রমণ—আঘাতের পর ভীষণতম আঘাত। মাত্র ১২৪ সেকেণ্ড সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে ম্যাক্সমেলিং দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপর তাঁর অচৈতন্য দেহ লুটিয়ে পড়ে সংগ্রাম-ক্ষেত্রের ধূলির পরে। ম্যাক্সমেলিং যখন সম্বিত ফিরে পেলেন, তখন তিনি হাসপাতালে শায়িত।

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৯ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত একাদিক্রমে অপরাজিত অবস্থায় ১১ বছর ৮ মাস ৭ দিন জো লুই বিশ্ববিজয়ীর খেতাবকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। দীর্ঘ এগার বছর এই সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁকে মোট ২৫টি লড়াইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিলো। মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে জো লুই-এর এই রেকর্ড আজও সগর্বে মাথা উঁচু করে রয়েছে। লুই তাঁর গৌরবোজ্জ্বল জীবনে মোট ৬২টি বিখ্যাত লড়াইতে অবতীর্ণ হয়ে ৫২টি নকআউটে এবং ৯টি পয়েন্টে বিজয়ী হয়েছেন। পরাজয় একবারই মাত্র এসেছে তাঁর পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল জীবনে।

বিভিন্ন মুষ্টিযুদ্ধ থেকে মোট ৪৪,৯৫,০০০ ডলার উপার্জন করেছেন লুই, যা অন্য কোন মুষ্টিযোদ্ধার পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। এ ছাড়াও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সৈনিকের জীবন যাপন করে প্রদর্শনীর সাহায্যে ৬৪,৯৮,০০২ ডলার সংগ্রহ করে তিনি দান করেন সৈনিকদের সাহায্য তহবিলে। লুই তাঁর জীবনে যেমন

অজস্র অর্থ উপার্জন করেছেন, তেমনি সেই উপার্জিত অর্থের অধিকাংশই ব্যয় করেছেন কুণ্ঠাহীন চিত্তে। বন্ধু-বান্ধব, দরিদ্র, দুঃস্থ তাঁর কাছ থেকে সবাই সাহায্য পেয়েছে। ব্যবসায়ী বুদ্ধির অভাবে প্রচুর অর্থ তিনি নষ্ট করেছেন। এ ছাড়াও মার্ভা ট্রটার ও ক্যারল ড্রেক নামে দুটি নারীও তাঁর উপার্জিত অর্থের অনেকখানি গ্রাস করেছেন।

লুই প্রথম বিবাহ করেন মার্ভা ট্রটারকে। ১৯৪৫ সালে মার্ভাকে পরিত্যাগ করে ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করেন তিনি। কিন্তু ১৯৪৯ সালে দ্বিতীয় পত্নীর সঙ্গেও তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। সম্প্রতি কয়েকমাস হলো তিনি তৃতীয়বার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। লুই-এর জীবনী নিয়ে সিনেমায় যে ছবি তোলা হয়েছে—বিশ্বের সকল দেশের দর্শকেরাই অনাবিল আনন্দের মাঝে সেই ছবি উপভোগ করেছেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় সময় এখন তরুণদের শিক্ষাদানের মধ্যে কেটে যায়। ফেলে-আসা দিনগুলির সুখ-স্মৃতি অনুভব করেন তিনি এই শিক্ষা-পর্বের মধ্য দিয়ে। বর্তমানে পেশাদারী মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতাতে জো লুইকে অবতীর্ণ হতে দেখা যাচ্ছে।

জো লুই আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মুষ্টিযুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও ইতিহাসের পাতায় নবতম বিস্ময় হিসাবে চিরদিন তিনি অভিহিত হবেন। মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে তাঁর অর্জিত রেকর্ড বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে ঘোষণা করবে তাঁর মুষ্টিক জীবনের অমর কীর্তি-কাহিনী।

অদ্বিতীয় এ্যাথলেট জেসি ওয়েন্স
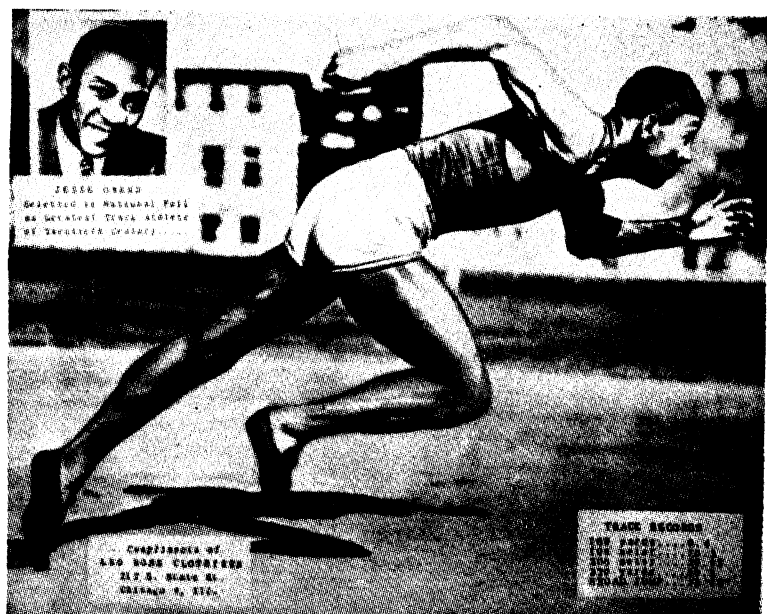
## জেসি ওয়েন্স

"হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান।
তুমি মোরে দানিয়াছ খৃস্টের সম্মান"—

জেসি ওয়েন্সের জীবনী দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামের জীবনী। অভাব-অভিযোগ—অসংখ্য বাধা-বিপত্তির মাঝেও মানুষের প্রতিভা যে বিকশিত হয়, মানুষ তার একনিষ্ঠ সাধনায় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পার্থিব বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে তার জয়যাত্রার পথ যে প্রশস্ত করে নিতে পারে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জেসি ওয়েন্স। দারিদ্র্যকে তিনি কখনো ভয় করেন নি। দারিদ্র্যের তাড়নায় তিনি তাঁর ব্রত থেকে বিচ্যুত হন নি।

যে দৌড়ায় সে দৌড়ে পারদর্শিতা লাভ করে, যে লাফায় সে লাফিয়ে খ্যাতি অর্জন করে, এই ছিল যখন পৃথিবীর খেলাধুলা জগতের স্বাভাবিক রীতি, তখন এক নিগ্রোবীরের আত্মপ্রকাশ হয়, যিনি দৌড়ানো বা লাফানো প্রতিযোগিতায় বিশ্বের সকল প্রতিযোগীদের বহু পশ্চাতে রেখে এমন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সৃষ্টি করেন, যা আজও অম্লান হয়ে রয়েছে। এত কম সময়ে দৌড়ে যে এরূপ দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব, মানুষ যে নিজের শারীরিক ক্ষমতায় এত দীর্ঘ দূরত্ব লাফ দিয়ে পার হতে পারে, এর দৃষ্টান্ত দেখে সমস্ত পৃথিবী বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায়।

১৯৩৬ সাল। হিটলারের দাপটে যখন পৃথিবীর সমস্ত শক্তি সন্ত্রস্ত, সেই সময়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলাধুলা প্রতিযোগিতার আসর অলিম্পিক প্রতিযোগিতা জার্মাণীতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৬ সালের এই অলিম্পিকে ওয়েন্স ১০০ মিটার দৌড় ১০·২ সেকেণ্ডে, ২০০ মিটার দৌড় ২০·১ সেকেণ্ডে, লংজাম্পে ২৬ ফুট ৫$\frac{১}{১৬}$ ইঞ্চি অতিক্রম করে এবং ৪ × ১০০ মিটার রিলেতে আমেরিকার রিলে দলকে জয়লাভে সহায়তা করে একাকী চারটি অলিম্পিকের স্বর্ণপদক লাভ করেন।

সেদিন যে চারটি প্রতিযোগিতায় ওয়েন্স স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন, ঐ চারটি বিভাগেই বিশ্বরেকর্ডের সৃষ্টি হয়েছিল। আজ দীর্ঘ ২০ বছর পর জেসি ওয়েন্সের জীবনী লিখতে বসে একথা গর্বের সঙ্গেই লিখতে পারছি যে, অলিম্পিকের সেই ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ের সময় এবং লংজাম্পের দূরত্ব আজও কেউ ভাঙতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, লংজাম্পে পরবর্তীকালে ওয়েন্স আরও বেশী দূরত্ব অর্থাৎ ২৬ ফুট ৮$\frac{1}{8}$ ইঞ্চি অতিক্রম করে যে বিশ্বরেকর্ডের সৃষ্টি করেন, তা আজও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রেকর্ড হিসাবে অম্লান হয়ে রয়েছে।

এই সাফল্যের পর পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল শ্রেণীর জনসাধারণ বার্লিন অলিম্পিককে জেসি ওয়েন্সের অলিম্পিক বলে ঘোষণা করেন। জার্মাণীর নাৎসী জনসাধারণ এবং ওয়েন্সের দেশবাসী সাদা চামড়ার সম্ভ্রান্ত আমেরিকানরা কালোচামড়ার নিগ্রোদের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা ভুলে গিয়ে ওয়েন্সকে বীরোচিত সম্মানে ভূষিত করেন। ওয়েন্সের এই অবিশ্বাস্য সাফল্যের পর সংবাদপত্রে সমালোচনা হয়—

'A record of such commanding excellence demands explanation. A theory has been advanced that through some physical characteristic of the race involving the bone and muscle construction of the foot and leg the Negro is ideally adapted to the Sprints and Jumping events'.

১৯১৩ সালে ১২ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার অন্তর্গত ডেকাটার আলাতে এক অত্যন্ত দরিদ্র কৃষক পরিবারে জেসি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল হেনরী ক্লেভল্যাণ্ড ওয়েন্স এবং মাতা ছিলেন এমা ফিটজেরাল্ড। ক্লেভল্যাণ্ড ওয়েন্স ছিলেন একজন ঢালাইকর। কিন্তু ঢালায়ের কাজকর্ম এত কম ছিল যে সংসার-

যাত্রার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হতো মাত্র কয়েক একর জমির উৎপন্ন তূলা ও শস্য থেকে। জমি থেকে শস্য ও তূলা যা উৎপন্ন হতো, সংসারের প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অতি সামান্য। এ ছাড়া জমিদারের খাজনাও ঐ শস্য ও তূলা বিক্রয়ের অর্থ থেকে দিতে হতো। চাষের সময় ক্লেভল্যাণ্ড ওয়েন্স খামারে চাষ করবার জন্য লোক নিতেন। জেসি মাত্র সাত বছর বয়স থেকেই তাঁর সাধ্যমত পিতার খামারের কাজে সাহায্য করতেন। মাঝে মাঝে যখন সুযোগ-সুবিধা হতো তখন তিনি স্কুলে যেতেন। স্কুল ছিল বাড়ি থেকে একমাইল দূরে। কিন্তু এই একমাইল পথ এত খারাপ ছিল যে সামান্য একটু বর্ষা হলেই মানুষ চলাচল করা সম্ভব হতোনা। ফলে অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও জেসি স্কুলে যেতে পারতেন না। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল। যে কোন বিষয় একবার বললেই তিনি বুঝে নিতে পারতেন।

অত্যন্ত কষ্টেই সংসারের দিন কাটছিল। এই অভাব থেকে সংসারকে কিছুটা রক্ষার জন্য জেসির মেজ বোন লীলা মে একটা চাকরি নিয়ে ক্লেভল্যাণ্ডে চলে আসেন। লীলা মে ছুটিতে বাড়িতে এসে এরূপ কষ্টে সংসার চলছে দেখে ক্লেভল্যাণ্ডে চলে যাবার জন্য পিতাকে পীড়াপীড়ি সুরু করেন। কিন্তু বৃদ্ধ পিতা বহু পুরুষের ভিটামাটি ও নিজের প্রিয় তূলার চাষ ছেড়ে কিছুতেই যেতে রাজী হন না।

১৯২২ সালে উইভিলস নামে একপ্রকার পতঙ্গের আক্রমণে সেবারকার সুন্দর ফসল একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। সংসার চালানোর অন্য কোন উপায় না দেখে ক্লেভল্যাণ্ড ওয়েন্স তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সব বিক্রি করে বড় ছেলে প্রেনটিসকে সঙ্গে করে ক্লেভল্যাণ্ডে চলে আসেন। সেখানে তাঁরা দুজনেই কাজ পেয়ে যান। তিন মাস পর জেসি, তাঁর মা ও অন্যান্য ভাইবোনেরাও ক্লেভল্যাণ্ডে চলে আসেন। এই ক্লেভল্যাণ্ডে চলে আসার ফলেই জেসির প্রতিভা

সেদিন যে চারটি প্রতিযোগিতায় ওয়েন্স স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন, ঐ চারটি বিভাগেই বিশ্বরেকর্ডের সৃষ্টি হয়েছিল। আজ দীর্ঘ ২০ বছর পর জেসি ওয়েন্সের জীবনী লিখতে বসে একথা গর্বের সঙ্গেই লিখতে পারছি যে, অলিম্পিকের সেই ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ের সময় এবং লংজাম্পের দূরত্ব আজও কেউ ভাঙতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, লংজাম্পে পরবর্তীকালে ওয়েন্স আরও বেশী দূরত্ব অর্থাৎ ২৬ ফুট ৮$\frac{1}{8}$ ইঞ্চি অতিক্রম করে যে বিশ্বরেকর্ডের সৃষ্টি করেন, তা আজও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রেকর্ড হিসাবে অম্লান হয়ে রয়েছে।

এই সাফল্যের পর পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল শ্রেণীর জনসাধারণ বার্লিন অলিম্পিককে জেসি ওয়েন্সের অলিম্পিক বলে ঘোষণা করেন। জার্মাণীর নাৎসী জনসাধারণ এবং ওয়েন্সের দেশবাসী সাদা চামড়ার সম্ভ্রান্ত আমেরিকানরা কালোচামড়ার নিগ্রোদের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা ভুলে গিয়ে ওয়েন্সকে বীরোচিত সম্মানে ভূষিত করেন। ওয়েন্সের এই অবিশ্বাস্য সাফল্যের পর সংবাদপত্রে সমালোচনা হয়—

'A record of such commanding excellence demands explanation. A theory has been advanced that through some physical characteristic of the race involving the bone and muscle construction of the foot and leg the Negro is ideally adapted to the Sprints and Jumping events'.

১৯১৩ সালে ১২ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার অন্তর্গত ডেকাটার আলাতে এক অত্যন্ত দরিদ্র কৃষক পরিবারে জেসি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল হেনরী ক্লেভল্যাণ্ড ওয়েন্স এবং মাতা ছিলেন এমা ফিটজেরাল্ড। ক্লেভল্যাণ্ড ওয়েন্স ছিলেন একজন ঢালাইকর। কিন্তু ঢালায়ের কাজকর্ম এত কম ছিল যে সংসার-

যাত্রার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হতো মাত্র কয়েক একর জমির উৎপন্ন তূলা ও শস্য থেকে। জমি থেকে শস্য ও তূলা যা উৎপন্ন হতো, সংসারের প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অতি সামান্য। এ ছাড়া জমিদারের খাজনাও ঐ শস্য ও তূলা বিক্রয়ের অর্থ থেকে দিতে হতো। চাষের সময় ক্লেভল্যাণ্ড ওয়েন্স খামারে চাষ করবার জন্য লোক নিতেন। জেসি মাত্র সাত বছর বয়স থেকেই তাঁর সাধ্যমত পিতার খামারের কাজে সাহায্য করতেন। মাঝে মাঝে যখন সুযোগ-সুবিধা হতো তখন তিনি স্কুলে যেতেন। স্কুল ছিল বাড়ি থেকে একমাইল দূরে। কিন্তু এই একমাইল পথ এত খারাপ ছিল যে সামান্য একটু বর্ষা হলেই মানুষ চলাচল করা সম্ভব হতোনা। ফলে অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও জেসি স্কুলে যেতে পারতেন না। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল। যে কোন বিষয় একবার বললেই তিনি বুঝে নিতে পারতেন।

অত্যন্ত কষ্টেই সংসারের দিন কাটছিল। এই অভাব থেকে সংসারকে কিছুটা রক্ষার জন্য জেসির মেজ বোন লীলা মে একটা চাকরি নিয়ে ক্লেভল্যাণ্ডে চলে আসেন। লীলা মে ছুটিতে বাড়িতে এসে এরূপ কষ্টে সংসার চলছে দেখে ক্লেভল্যাণ্ডে চলে যাবার জন্য পিতাকে পীড়াপীড়ি সুরু করেন। কিন্তু বৃদ্ধ পিতা বহু পুরুষের ভিটামাটি ও নিজের প্রিয় তূলার চাষ ছেড়ে কিছুতেই যেতে রাজী হন না।

১৯২২ সালে উইভিলস নামে একপ্রকার পতঙ্গের আক্রমণে সেবারকার সুন্দর ফসল একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। সংসার চালানোর অন্য কোন উপায় না দেখে ক্লেভল্যাণ্ড ওয়েন্স তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সব বিক্রি করে বড় ছেলে প্রেনটিসকে সঙ্গে করে ক্লেভল্যাণ্ডে চলে আসেন। সেখানে তাঁরা দুজনেই কাজ পেয়ে যান। তিন মাস পর জেসি, তাঁর মা ও অন্যান্য ভাইবোনেরাও ক্লেভল্যাণ্ডে চলে আসেন। এই ক্লেভল্যাণ্ডে চলে আসার ফলেই জেসির প্রতিভা

বিকশিত হবার সুযোগ পায়। তাঁকে 'সেন্টক্লেয়ার প্রাথমিক স্কুলে' ভর্তি করে দেওয়া হয়।

কিন্তু অভাবের তাড়না থেকে জেসিদের সংসার তখনো বিন্দুমাত্র রেহাই পায়নি। কখনো জুতো পালিশ করে, কখনো অন্য অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে তিনি বড় হয়ে উঠতে থাকেন। স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যাহ্ন ভোজ ও দুধ স্কুলে পৌঁছে দিয়ে তাঁর একবেলার আহারের ব্যবস্থা হতো। এত পরিশ্রম ও কষ্ট করেও লেখাপড়ার ওপর তাঁর আকর্ষণ অটুট ছিল। বোল্টন স্কুল থেকে সংসারের সকলকে আশ্চর্যান্বিত করে তিনি ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বোল্টন স্কুল আর ফেয়ারমাউন্ট জুনিয়ার হাই স্কুল—এ দুটো ছিল পাশাপাশি স্কুল। ফলে, এই স্কুল দুটোর মধ্যে প্রায়ই খেলাধুলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। এমন কি খেলাধুলা এই স্কুলের নিয়মিত পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ফেয়ারমাউন্ট স্কুলের ছাত্রদের উৎসাহেই ওয়েন্সের দৌড়ানো ও লাফানোর ওপর ঝোঁক আসে। ক্রমশ তাঁর এই আকর্ষণ এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে, তিনি মাকে ঐ স্কুলে তাঁকে ভর্তি করার জন্যে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন। এই স্কুলে এসে ওয়েন্স তাঁর শিক্ষাগুরু চার্লি রিলের সাক্ষাৎ পান। পক্ককেশ ও কিছুটা বধির চার্লি রিলে ছিলেন ফেয়ারমাউন্ট স্কুলের ট্রাক কোচ। ছেলেদের ট্রাক ও ফিল্ডের বিভিন্ন শিক্ষা দেওয়া ছাড়া পৃথিবীতে তাঁর অন্য কোন আনন্দ বা আকর্ষণ ছিল না। কোনরূপ বিশ্রাম না নিয়ে এমন আন্তরিক ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি ছেলেদের শিক্ষা দিতেন যে, চার্লিকে বলা হতো—"তিনি ট্রাকের ওপরেই আহার করেন, ট্রাকেই নিদ্রা যান এবং ঐ ট্রাকই তাঁর একমাত্র বিশ্রামস্থল।" চার্লি, ওয়েন্সকে দেখেই তাঁর মাঝে এক বিরাট সুপ্ত প্রতিভার সাক্ষাৎ পান। চার্লির মনে হয়, এই কিশোর উপযুক্ত শিক্ষা পেলে ট্রাক ও ফিল্ডে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। তাই স্কুলের ছুটির পর তিনি ওয়েন্সকে অন্যান্য ছেলেদের থেকে আলাদা

করে শিক্ষা দেওয়া সুরু করেন। অনুশীলনের পর ওয়েন্সকে নিয়ে তিনি পার্কে বেড়াতে যেতেন। নিরালায় বসে গল্প শোনাতেন পৃথিবীর বড় বড় দৌড়বীরদের কথা। ওয়েন্স মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। সন্তানের অধিক স্নেহ করতেন তিনি ওয়েন্সকে। অভাবের তাড়নায় ওয়েন্সের মনকে যখন তিনি বিচলিত বা বিমর্ষ দেখেছেন, তখনই তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে সাহস দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, বলেছেন—

"প্রভাত সূর্য্য, এসেছে রুদ্র সাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে"

ফেয়ারমাউণ্ট স্কুলে দৌড়াতে হলে ডাক্তারের সার্টিফিকেটের এবং অভিভাবকদের সম্মতির প্রয়োজন হতো। ওয়েন্স এই সার্টিফিকেট সই করবার জন্যে মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বিফল মনোরথ হন। শেষে মাকে গোপন করে মেজ বোন লীলা মে'কে দিয়ে ঐ সার্টিফিকেট সই করিয়ে তবে স্কুলদলে স্থান লাভ করেন। চার্লি রিলের চেষ্টায় ওয়েন্স ক্রমশই উন্নতি লাভ করতে থাকেন। দৌড়ানোর অনুশীলন করে স্কুল থেকে ফিরতে দেরি হতো বলে প্রত্যহই মায়ের ভর্ৎসনা তাঁকে শুনতে হতো এবং প্রত্যহই তিনি কৈফিয়ৎ দিতেন যে মিস্টার চার্লি রিলে তাঁকে আটকে রেখেছিলেন। শেষে তাঁর মা রাগে একদিন অগ্নিশর্মা হয়ে চার্লিকে তাঁর বাড়িতে ডেকে আনতে বলেন। পরের দিন মিস্টার চার্লি, ওয়েন্সের মাকে বুঝিয়ে বলায় তবে ওয়েন্স মায়ের ভর্ৎসনা থেকে রেহাই পান।

চার্লির অধীনে ওয়েন্সের শিক্ষা নিয়মিত চলতে থাকে। দৌড়ানোর ট্রাক না থাকায় রাস্তার পাশেই এই দৌড়ানোর অনুশীলন হতো। বিভিন্ন দূরত্বের দৌড়ের অভ্যাস তাঁকে করতে হতো। কখনো কখনো এত তীব্র বেগে তিনি দৌড়াতেন যে চার্লি ভাবতেন তাঁর ঘড়ি বোধ হয় বন্ধ হয়ে গেছে। এই সময় ওয়েন্স ২৩ ফুট লংজাম্প দিতে পারতেন। ১২০ গজ নিচু হার্ডলস ১৫·৩ সেকেণ্ডে এবং ২২০ গজ দৌড় তিনি ২৪·৭ সেকেণ্ডে অতিক্রম করতে পারতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই এই ২২০ গজ দৌড়ের দূরত্ব ২২·১ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে তিনি এ্যাথলেটিকস্‌-এ এক নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

ফেয়ারমাউণ্ট স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি 'ইস্ট টেকনিক্যাল হাই স্কুলে' ভর্তি হন। এডওয়েল এখানে তাঁর নূতন শিক্ষক হলেও ওয়েন্স তাঁর শিক্ষাগুরু চার্লির কাছে প্রত্যহ যেতেন এবং উপদেশ নিতেন। এই স্কুলে পড়বার সময়ও তিনি স্কুলের বাগানে কাজ করে সপ্তাহে ৬ শিলিং করে উপার্জন করে সংসারকে সাহায্য করতেন।

ওয়েন্স ও চার্লির যুগ্ম চেষ্টায় তিনি অচিরেই ইস্ট টেকনিক্যাল স্কুলের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেট হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতা চিকাগোতে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় ওয়েন্স ১০০ গজ দৌড় বিশ্বরেকর্ডের সমান সময়ে ৯·৪ সেকেণ্ডে অতিক্রম করেন। এ ছাড়াও ব্রড জাম্পে ২৪ ফুট ১১ ইঞ্চি লাফিয়ে এবং ২২০ গজ দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে শুধু আমেরিকা নয়, সারা বিশ্বে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। তাঁর নাম সারা আমেরিকায় এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, এই স্কুল থেকে পাস করবার পর ২৮টি কলেজ থেকে যোগদান করবার জন্য তিনি অনুরোধপত্র পান। কোন কোন কলেজ থেকে তাঁকে চার বছরের জন্য বৃত্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

ঐ সব বিভিন্ন প্রলোভন পাওয়া সত্ত্বেও ওয়েন্স নিজ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ওহিওতে যোগদান করেন। ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যারী স্নাইডার ছিলেন সব থেকে কর্মদক্ষ ট্রাক 'শিক্ষক। ল্যারী স্নাইডার ওয়েন্সের বিরাট ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সকল সময় উৎসাহ দিতেন। ওয়েন্স সুযোগ পেলেই কিন্তু বাড়িতে চলে আসতেন। মায়ের স্নেহ ও তাঁর ভাবীপত্নী প্রতিবেশী মিস সোলোমনের প্রেম তাঁকে বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেশী দিন থাকতে দিতো না। ওহিওতে পড়বার সময়ে তাঁকে 'এলিভেটর অপারেটার'

হিসাবে এমন কি গ্রীষ্মাবকাশে বাড়িতে বসেও মোটরে তেল নেবার পাম্পে কাজ করে সংসারে অর্থ-সাহায্য করতে হতো।

১৯৩৫ সালে ২৫শে মে ওয়েন্সের জীবনে, শুধু ওয়েন্সের জীবনে কেন, খেলাধুলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই শুভদিনে তিনি ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে চিকাগোতে অনুষ্ঠিত পশ্চিম আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় ২২০ গজ দৌড়, ২২০ গজ নিচু হার্ডলস এবং ব্রড জাম্পে নূতন বিশ্বরেকর্ডের সৃষ্টি করেন। তাঁর ১০০ গজ দৌড়ের সময়ও বিশ্বরেকর্ডের সমান হয়।

ওয়েন্সের পিতা এই সময়ে প্রায় দুবছর বেকার-জীবন যাপন করায় সাংসারিক অভাব অভিযোগে ওয়েন্স অত্যন্ত বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে ঘোষণা করেন যে অচিরেই যদি তাঁর পিতা কোন উপযুক্ত কাজ না পান, তাহলে তিনি ওহিও বিশ্ববিদ্যালয় এমন কি এ্যাথলেটিক জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়িতে চলে যাবেন। কিন্তু ওয়েন্স তখন সমস্ত আমেরিকার আশাস্থল। দৌড়ানো বা লাফানো যদি তিনি ছেড়ে দেন তাহলে আগামী বার্লিন অলিম্পিকে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব কে প্রতিষ্ঠিত করবে? ফলে, প্রত্যহ অসংখ্য চাকরির নিয়োগপত্র এসে হাজির হতে থাকে ওয়েন্সের পিতার কাছে।

ওয়েন্সের প্রতিভা এই সময়ে সর্বোচ্চ শিখরে। ক্যালিফোর্ণিয়ায় আমেরিকার শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেটদের প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক সাফল্য লাভ করে অবিসংবাদিতরূপে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ওয়েন্স পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবার সময়ে সংবাদপত্রে এক খবর প্রকাশিত হয় যে, ওয়েন্স নাকি কুইনকেলা নিকারসন নামে এক ধনীকন্যার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন। তাঁর বাল্য প্রণয়িনী মিস রাথ সোলোমন এই সংবাদ পেয়ে এত বিচলিত হয়ে পড়েন যে, তিনি এ ব্যাপারে আদালতের স্মরণাপন্ন হবেন বলে ঘোষণা করেন। ওয়েন্স দেশে ফিরে এসেই বাল্যসখীর মানভঞ্জন করেন। সকল সন্দেহের অবসান হয়। এক সুন্দর প্রভাতে

খেলাধুলার মধ্য দিয়ে যে কোন শিশুকে তার সকলপ্রকার মলিনতা থেকে মুক্ত করে সুস্থ, সবল ও দরদী মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা যায়, একথা তিনি বিশ্বাস করেন বলেই শিশুদের মাঝে অধিক সময় তিনি অতিবাহিত করেন। তাঁর নিজের ধারণা খেলাধুলার শিক্ষা দিতে হলে শৈশব থেকেই সেই শিক্ষা সুরু করা উচিত। বর্তমানে তিনি ইলিনিয়েজ স্টেট এ্যাথলেটিক কমিশনের অন্যতম কমিশনার। ওয়েন্সের বর্তমান বয়স ৪২ বছর। স্ত্রী ও তিনটি সন্তানের সঙ্গে আনন্দেই তাঁর দিন কেটে যায়।

১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে ভারতীয় জনসাধারণ এই বিশ্ব-বিখ্যাত এ্যাথলেটকে দেখবার সুযোগ লাভ করে। ১৫ দিন ব্যাপী শুভেচ্ছা সফরে এসে ওয়েন্স ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এ্যাথলেটিকস-এর উন্নত কৌশল কি করে আয়ত্ত করা যায় তার শিক্ষা দান করেন। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে এ্যাথলেটিকসে ভারতের কোন উল্লেখযোগ্য স্থান না থাকলেও কঠিন অনুশীলন ও সাধনার মাধ্যমে ভারতীয় এ্যাথলেটরা অদূর ভবিষ্যতে ভারতের মুখোজ্জ্বল করতে সক্ষম হবেন বলে তিনি আশা করেন।

টেবিলটেনিস যাদুকর ভিক্টর বার্ণা

# ভিক্টর বার্ণা

বিভিন্ন খেলাধূলায় প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের আবির্ভাব যুগে যুগে হয়েছে। একজন খেলোয়াড়ের অন্তর্ধানের পর হয়ত আরও বেশী প্রতিভাসম্পন্ন খেলোয়াড় আবির্ভূত হয়ে আরও বেশী স্মরণীয় হয়ে গেছেন। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলার উপকারিতার কথা মানুষ যতই জানতে পারছে, খেলাধুলা করবার আকর্ষণও মানুষের ততই বেড়ে যাচ্ছে। এই দুর্নিবার আকর্ষণে খেলাধুলা যেমন দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে তেমনি খেলাধুলায় বিস্ময়কর প্রতিভায় উজ্জ্বল খেলোয়াড়েরা পূর্বের ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়ে নব নব গৌরবে নিজেদের স্মরণীয় ও বরণীয় করে তুলছেন। কিন্তু এই স্বাভাবিক নিয়মের মাঝেও দুএকজন এমন অস্বাভাবিক প্রতিভাসম্পন্ন খেলোয়াড় জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁদের প্রতিভা শুধু সমসাময়িক কালে নয়, যুগে যুগে মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভে সমর্থ হবে।

টেবিলটেনিস খেলায় ভিক্টর বার্ণার মত অনন্য প্রতিভার আজও জন্মলাভ হয়নি। বার্ণার ক্রীড়াকৌশল যেমন অপূর্ব ও বিস্ময়কর, তেমনি তাঁর সাফল্যের ইতিহাস স্মরণীয়। ১৯৫৫ সালে ৪ঠা জানুয়ারী তাঁর জীবনী জানবার জন্যে যখন গ্র্যাণ্ড হোটেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তখন সেই সরল, নিরভিমান এবং ভারতীয় টেবিল টেনিস খেলার পরম হিতৈষী বন্ধু নিজমুখে যে কাহিনী বলেছিলেন, সেইটাই এখানে লিপিবদ্ধ করলাম।

"তুমি হয়তো ভাবছো, তুমি কেন অনেকেই ভাবে, বার্ণা হয়ত টেবিলটেনিস ব্যাট নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলো, কিন্তু সত্যিই তা নয়। ছেলেবেলায় আমার টেবিলটেনিস খেলার ওপর কোন আকর্ষণ ছিল না, এমন কি এই খেলা দেখতেও তেমন উৎসাহ পেতাম না। আমার পরিবারেও এ খেলার প্রচলন ছিল না। আমার যারা বন্ধু ছিল

তারাও কেউ এ খেলা খেলতো না। ছেলেবেলা থেকে আমার ফুটবল খেলার উপরই ঝোঁক ছিল বেশী।

১৯১১ সালে ২৪শে আগস্ট আমি হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্টে জন্মগ্রহণ করি। দানিয়ুব নদীর তীরে এই সুন্দর শহরে আর পাঁচজন সাধারণ ছেলেদের মতই আমার বাল্যজীবন হৈ-চৈ করে কেটে যায়। আমার বয়স যখন সাড়ে তেরো বছর, তখন কয়েক বন্ধুসহ এক বাড়িতে নৈশ ভোজে আমন্ত্রিত হই। আহারের পর সেই খাবার টেবিলে জীবনে প্রথম টেবিলটেনিস খেলি। প্রথম দিনের খেলায় আমার সঙ্গী ছিল এল বেলাক। এই বেলাক শুধু আমার বাল্যবন্ধু নয়, টেবিলটেনিস খেলায় সে-ই আমার শিক্ষক ও প্রেরণার উৎস।

প্রথম দিন থেকেই খেলাটির মধ্যে একটা তীব্র আনন্দ উপভোগ করতাম। শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায়, জাগরণে টেবিলটেনিস খেলা আমায় আহ্বান করতে লাগলো। কিন্তু আমি তো কোন ক্লাবের সভ্য ছিলাম না। আর সেদিন এই খেলার আজকের মত প্রচলনও ছিল না। তাই আমি ও বেলাক এখানে সেখানে খেলে মনের আবেগ মেটাতে লাগলাম। খেলাটা যতই ধাতস্থ হতে লাগলো, খেলার নেশা যেন ততই বেড়ে যেতে লাগলো। ১৯২৫ সালে আমি প্রথম হাঙ্গেরীর ছোটদের প্রতিযোগিতায় যোগদান করি এবং জাবাডোসের কাছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর পরাজিত হই। জীবনে এই প্রথম প্রতিযোগিতার পরাজয়ে সেদিন আমার এত ব্যথা লেগেছিলো যে সেই খেলার প্রত্যেকটি মার ও প্রত্যেকটি পয়েণ্ট আজও আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সেদিনের খেলা-শেষে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে জাবাডোসকে হারিয়ে আমি এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। কিন্তু ফুটবল খেলার ওপর তখনও আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ কমেনি। তখনও হাঙ্গেরীর ছোটদের মধ্যে আমি একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় এবং সেই কারণেই ১৯২৬ সালে

ছোটদের আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় আমি হাঙ্গেরীর জাতীয় দলে স্থানলাভ করি।

১৯২৭ সালে হাঙ্গেরীর জুনিয়ার টেবিলটেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপে আমি জাবাডোসকে পরাজিত করে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করি। এই সাফল্যলাভের পর আমার মনে হয় ফুটবল কি টেবিল-টেনিস এই দুটো খেলার যে-কোন একটা খেলা আমাকে ছাড়তেই হবে, না হলে আমি কোন খেলাতেই সাফল্যলাভ করতে পারবো না। ছেলেবেলা থেকে যে ফুটবল খেলাকে সবচেয়ে ভালবেসেছি, হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছি যে খেলা—যার জন্য হাতে পায়ে পেয়েছি কত ব্যথা এবং সেই যন্ত্রণায় নিজে কষ্ট পেয়েছি—মাকে দিয়েছি কত কষ্ট। তবুও সেই প্রিয় ফুটবল খেলাকে ত্যাগ করতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হলাম এবং আমার সমস্ত সাধনা ঢেলে দিলাম টেবিলটেনিসের মধ্যে। অবশ্য, খেলার জন্য আমার লেখাপড়া কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে আমি সচেতন ছিলাম।

১৯২৮ সালে আমি হাঙ্গেরীর সাধারণ বিভাগের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করি। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত হাঙ্গেরীর সোয়েদলিং কাপ দলে আমার স্থান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এর মধ্যে ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত সোয়েদলিং কাপ প্রতি বছরই হাঙ্গেরীর ঘরে এসে উঠেছে এবং হাঙ্গেরীর এই দীর্ঘ বিজয়-অভিযানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ খেলাগুলিতে আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে।

টেবিলটেনিসের বিশ্বপ্রাধান্য প্রতিযোগিতায় ১৯২৯-৩০ সালে আমি সর্বপ্রথম বিজয়ীর গৌরব লাভ করি। তারপর ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৩৩ এবং ১৯৩৪—এই চার বছরও বিজয়ীর পুরস্কার 'সেণ্ট ব্রাইড ভেস' থাকে আমারই দখলে। তাছাড়া ডাবলস্-এ ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছি উপর্যুপরি সাত বছর। এই সাত বছরের মধ্যে, ছয় বছর জাবাডোস ও এক বছর গ্লানজ

আমার সহখেলোয়াড় ছিলেন। ডাবলস্-এ আমার সর্বশেষ সাফল্য ১৯৩৮-৩৯ সালে। এই বছর বার্গম্যান ছিলেন আমার দোসর। ১৯৩২ ও ১৯৩৫ সালে মিক্সড ডাবলস্-এ আমি এ. সিপোসকে সঙ্গিনী করে 'হেডুসেক কাপ' জয়লাভ করি। অবশ্য এই বুড়ো বয়সে গত ১৯৫৩ সালেও ডাবলস্-এর খেলায় ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠবার গৌরব আমি লাভ করেছিলাম।

যখন তুমি নাছোড়বান্দা তখন শোন—১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বিশ্বের সকল বিখ্যাত প্রতিযোগিতায় আমি অংশ গ্রহণ করেছি, কিন্তু কোন খেলোয়াড়ের কাছে কোন খেলাতেই আমি পরাজিত হইনি। এমন কি, আমার বিরুদ্ধে কোন খেলোয়াড় এই চার বছরের মধ্যে একটি গেমও ছিনিয়ে নিতে পারেন নি।

অপ্রতিহত জয়লাভের প্রশস্ত পথ ধরে যখন কীর্তির সোপান বেয়ে ধীরে ধীরে উঠতে সুরু করেছি, সেই সময়ে বিধির অমোঘ বিধানে আমার যাত্রাপথ হলো বন্ধুর—গতিপথ হল রুদ্ধ। আমার প্রতিভা যখন সর্বোচ্চশিখরে, সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯৩৫ সালে আমি এক সাংঘাতিক মোটর দুর্ঘটনায় ভীষণভাবে আহত হই। চিকিৎসকেরা আমার জীবনের আশা ছেড়ে দেন। কিন্তু এত শীঘ্র যে আমার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়, এটা বোধ হয় ভগবানের অভিপ্রেত ছিল না। তাই ডাক্তারেরা শেষ পর্যন্ত বললেন যে, বার্ণা এ যাত্রা বেঁচে গেলো কিন্তু টেবিলটেনিস ব্যাট ও আর জীবনে কখনো ধরতে পারবে না। তার অন্যতম কারণ ছিল যে, সব থেকে বেশী আঘাত লেগেছিলো আমার ডান হাতে। কিন্তু আমার বিশ্বাস হতো না ডাক্তারদের ঐ সব কথা। শুয়ে শুয়ে ভাবতাম, যে খেলাকে আমি এত ভালবাসি, যে খেলা ছেড়ে আমি একদিনের জন্যে থাকতে পারি না, সে খেলা জীবনে আর খেলতে পারবো না, এ কি সম্ভব? যাকে মানুষ অন্তর দিয়ে ভালবাসে—সে ব্যক্তি বা বস্তু যাই হোক না কেন—সে কি তাকে এই ভাবে উপেক্ষা করতে পারে।

টেবিলটেনিস আমি খেলবোই। টেবিলটেনিস খেলা কখনো আমাকে পরিত্যাগ করতে পারে না।

১৯৩৬ সালের শেষাশেষি আমি পুনরায় খেলা সুরু করি। কিন্তু খেলায় সে আগের নৈপুণ্য নষ্ট হয়ে যায়, মারের তীব্রতাও যায় অনেক কমে। যে বার্ণার তীব্র ড্রপ সট টেবিলে পড়লে বিপক্ষ খেলোয়াড়েরা বলটাকে দেখবার সুযোগ পেতো না, সেই বার্ণার মারের তীব্রতা হয়ে পড়ে আর পাঁচজন সাধারণ প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ের মত।" বলে জামার আস্তিনটা সরিয়ে দিলেন। তাকিয়ে দেখলাম ডানহাতের কনুই থেকে তালু পর্যন্ত লম্বা বিরাট একটা কালো দাগ। যেন একটা সরু কালো সাপ হাতের সঙ্গে লেগে রয়েছে। ঐ কালো সাপটির উপর হাত বোলাতে বোলাতে বার্ণা যেন দু-এক মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে গেলেন। বুঝলাম কত ব্যথা তাঁর অন্তরে এই আঘাতটির জন্যে। কিছুক্ষণ পরে আবার বললেন, "১৯৩৬ সালের শেষের দিকে যদিও আমি খেলা সুরু করেছিলাম কিন্তু বেশিক্ষণ খেললেই আমার হাতে যন্ত্রণা হতো। তাই বিশ্ব টেবিল-টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস-এর শেষের দিকের রাউণ্ডের খেলায় যে তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো, সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি আমার হাতের শক্তি হারিয়ে ফেলতাম। সেই কারণে বিশ্ব টেবিল-টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস-এর সেমিফাইন্যাল ও ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠলেও বিজয়ীর সম্মান আর লাভ করতে পারি না। আমার হাত যে তখনো রোগমুক্ত হয়নি একথা তখন অবশ্য বুঝতে সুরু করেছি। বুঝেছি যে হাতের কালোসাপটি একেবারে মরে যায়নি, সুবিধে পেলেই আমায় দংশন কচ্ছে। পরে বলছি কি করে আমি ঐ দংশন বা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলাম। কিন্তু যখন আমি মুক্তি পেলাম বা রোগমুক্ত হলাম তখন বয়স গিয়েছে অনেক বেড়ে—শরীরে জড়তা আসতে সুরু করেছে।

১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত প্যারিসে অবস্থানকালে

পৃথিবীর টেবিলটেনিস খেলায় উন্নত অধিকাংশ দেশগুলি আমি সফর করি। ১৯৩৭ সালে আমি প্যারিস ত্যাগ করে যাত্রা করি ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে। ১৯৩৮ সালে বেলাকের সঙ্গে এবং ১৯৪৯ সালে আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে ভারত সফরে আসি। প্যারিস আর ইংলণ্ডে বসবাস করলেও ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত অবশ্য আমি হাঙ্গেরীর নাগরিক ছিলাম।

১৯৩৯ সালের ৭ই এপ্রিল আমার জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনের এক শুভলগ্নে আমি এঁকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে লাভ করি—বলেই পাশে মিসেস বার্ণা বসেছিলেন তাঁকে দেখিয়ে দিলেন। যাই হোক, আমি আগেই বলেছি যে আমার হাত তখনো রোগমুক্ত হয়নি। ডাক্তারেরা সন্দেহ করতে লাগলেন যে হাতের ভেতরে বোধ হয় কোন লোহার টুকরো রয়েছে। ১৯৪২ সালে আমার হাতে অস্ত্রোপচার হয় আর এই অস্ত্রোপচারের ফলে সত্য সত্যই একটা লোহার টুকরো বার হয়। ১৯৪৬ সালে আমি 'ডানলপ কোম্পানীতে' যোগদান করি। আজও ঐ কোম্পানীতে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই কাজ কচ্ছি।

১৯৪৯ সাল থেকে ইংলণ্ডে স্থায়িভাবে আমি বসবাস সুরু করি। এই ১৯৪৯ সালটি আরও নানা কারণে আমার কাছে স্মরণীয়। এই বছর সরকারীভাবে আমি সিঙ্গলস খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করি। আমার এই অবসর গ্রহণ করবার সময়ে পৃথিবীর সকল জাতীয় টেবিলটেনিস এসোসিয়েশন যুগ্মভাবে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান করেন। এই অনুষ্ঠানে আমি পৃথিবীর সকল দেশের টেবিল-টেনিস এসোসিয়েশনের কাছ থেকে প্রীতির চিহ্নস্বরূপ বহু মূল্যবান উপহার লাভ করি। এ ছাড়াও সংগৃহীত অর্থ থেকে ছোটদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করবার জন্য 'বার্ণা-ফাণ্ডে'র সৃষ্টি করা হয়। ১৯৫৩ সালে বিশ্ব টেবিলটেনিস প্রতিযোগিতার ডাবলস্-এর ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠলেও আর কোন প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অংশ

গ্রহণ করবার আমার ইচ্ছা নেই। এখন আগামী দিনে যাদের বিজয়ী হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে, তাদের বিজয়ের মধ্যেই নিজের সাফল্যের আনন্দ পেতে চাই।"

বার্ণা সেই ব্রতই আজ গ্রহণ করেছেন। ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে রাজকুমারী অমৃত কাউর-এর শিক্ষা-ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতীয় খেলোয়াড়দের শিক্ষা দেবার জন্য তিনি ভারতে এসেছিলেন এবং ভবিষ্যতেও হয়ত আসবেন। খেলোয়াড় হিসাবে তিনি যেমন অতুলনীয়, শিক্ষক হিসাবেও তিনি অনন্য। ভারতীয় নবীন খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে তাঁর আশা বিরাট। তিনি বললেন যে, আমি ৫-৬ জন এমন উদীয়মান খেলোয়াড় দেখেছি, যারা উপযুক্ত শিক্ষা পেলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীর যে কোন খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে।

বিশ্ব টেবিলটেনিস খেলার বিভিন্ন বিভাগে তাঁর বিজয়গৌরবের রেকর্ড বা ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বিশ্বের কোন খেলোয়াড়ের কাছে একটি গেম-এও পরাজিত না হবার ইতিহাস আগামী দিনের আগন্তুকদের কাছে রূপকথার কাহিনীর মত হয়ত শোনাবে। কিন্তু এই অবিশ্বাস্য ইতিহাসই তাঁকে অমর করে রাখবে কালের রথচক্রের নিষ্পেষণের মাঝে।

শুধু ঐতিহাসিক বা অনন্য খেলোয়াড় হিসাবে ছাড়াও তিনি ভারতীয় জনসাধারণের কাছে ভারতবন্ধু হিসাবে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভারতে টেবিলটেনিস খেলার উন্নতি ও প্রচারে উৎসাহী বন্ধু বার্ণা ১৯৩৮ সালে ভারত সফরে এসে কলকাতায় তাঁর প্রদর্শনী খেলায় প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ না করে যে কাপটি দান করে যান, সেই মহাদানের স্মৃতিচিহ্ন 'বার্ণা বেলাক কাপ' আজ ভারতের আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতার বিজয়ীর পুরস্কার। ১৯৪৯ সালে দ্বিতীয়বার ভারত সফরে এসেও তিনি ও তাঁর স্ত্রী আর একটি প্রীতির চিহ্ন রেখে যান 'সুসান বার্ণা কাপ' নামে। ভারতের জাতীয়

টেবিলটেনিস প্রতিযোগিতায় ঐ কাপটিই আজ মহিলাদের ডাবলস্-এ বিজয়িনীদের পুরস্কার।

বার্ণার খেলা যাঁরা না দেখেছেন, তাঁদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় যে তিনি কত নিপুণ ও দক্ষ খেলোয়াড়। বার্ণা টেবিলটেনিসের শিল্পী—টেবিলটেনিসের যাদুকর। শিল্পী যেমন তাঁর প্রত্যেকটি ছবির মাঝে নব নব রূপ ফুটিয়ে তোলেন, তেমনি বার্ণার প্রত্যেকটি মার এমন কি প্রত্যেকটি পদক্ষেপেও ফুটে ওঠে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। কত প্রাণবন্ত, কত সুন্দর যে তাঁর খেলা তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই তিনি বিশ্ববরেণ্য—সর্বকালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকৃত।

আলোচনার পালা শেষ করে উঠতে গেলাম। বার্ণা বললেন, "বসো, আরও একটু গল্প করি।" এইটুকু সময়ের মধ্যে এতো আপনার করে নিয়েছেন যে আমারো উঠতে ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু কাজের তাগিদে উঠতেই হলো। নিচে নেমে এলেন সঙ্গে সঙ্গে তিনতলা থেকে এক তলায়। বিদায় নেবার সময় আমায় জড়িয়ে ধরে বললেন, "বন্ধু ভুলে যেওনা আমার কথা। কোনদিন টেবিলটেনিস খেলার কোন বিষয়ে আমার কোন অভিমত যদি তোমাকে সাহায্য করে, তবে সে সাহায্য বন্ধু হিসাবে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ ক'রো।" শ্রদ্ধায় মনে মনে প্রণাম জানালাম পায়ের দিকে চেয়ে—মুখ দিয়ে আপনা থেকে বেরিয়ে এলো—"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ"।
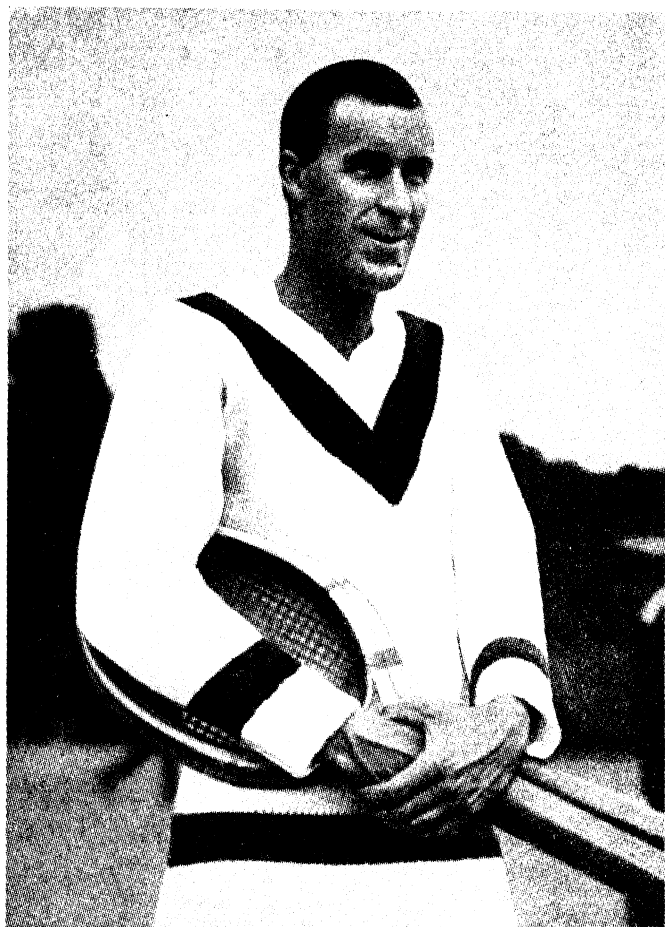
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় বিগ বিল টিল্ডেন

## উইলিয়াম টিল্ডেন

১৮৭৩ সালে উইংফিল্ড নামে একজন ইংরেজ টেনিস খেলা আবিষ্কার করেছিলেন। তারপর এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কত দেশের কত খেলোয়াড়ের আবির্ভাব হয়েছে। বিস্ময়কর প্রতিভায় তাঁরা যেমন নিজেকে মহিমান্বিত করেছেন, তেমনি দেশকে করেছেন গৌরবোজ্জ্বল। কিন্তু সেই সব স্মরণীয় টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? এ প্রশ্ন যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন? তাহ'লে বিনা দ্বিধায় বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে যে নামটি আপনার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হবে সে নামটি হলো 'বিগ বিল টিল্ডেন।' বিশ্বের টেনিস উৎসাহী জনসাধারণের অন্তরের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা মেশানো ঐ নামে তিনি পরিচিত হলেও তাঁর আসল নাম দ্বিতীয় উইলিয়াম টেটাম টিল্ডেন।

টেনিস ইতিহাসের স্বর্ণযুগে দীর্ঘ দশ বছর ধরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে বা আমেরিকার টেনিসে দীর্ঘস্থায়ী সম্রাট হিসাবে টিল্ডেনকে বর্ণনা করলে তাঁর প্রতিভাকে ছোট করা হয়। টেনিস খেলায় যা কিছু সুন্দর, যা কিছু দর্শনীয়, যা কিছু প্রয়োজনীয়, তার সমস্ত গুণাবলীর শুধুমাত্র তিনি অধিকারী ছিলেন না—ছিলেন শ্রেষ্ঠ—সর্বজ্ঞ। ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর যেমন অসাধারণ, তেমনি ছিল তাঁর খেলায় ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করবার ক্ষমতা। খেলার মোহিনী মায়ায় তিনি দর্শকদের মনোজগতে এমন আলোড়ন তুলতেন যে মাঠে তাঁর উপস্থিতিই শিহরণ জাগাতো দর্শক-মনে—দেহে জাগাতো রোমাঞ্চ। তাই শুধু দিকে দিকে তাঁর জয়শঙ্খ বেজে উঠেই নিস্তব্ধ হয়ে যায়নি, সেই শঙ্খধ্বনির সুর আজও লেগে আছে সংখ্যাতীত জনগণের কানে—মনের মণিকোঠায় রয়েছে তাঁর টেনিস নৈপুণ্যের মাধুর্য-সুষমা।

১৮৯৩ সালে ১০ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ার

অন্তর্গত জার্মাণটাউনে টিল্ডেন জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন এই বালক কৈশোরে টেনিস জগতে প্রবেশ করার মুখে বারে বারে পেয়েছেন বাধা—পেয়েছেন অবজ্ঞা। কিন্তু নিরুৎসাহ হননি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীলন করেছেন অবিশ্রান্তভাবে। বিকৃত-বুদ্ধি বলে লোকে তাঁকে উপহাস করেছে। টেনিস খেলায় উন্নতিলাভ অসম্ভব বলে তাঁকে ভগ্নোৎসাহ করেছে। তবুও তিনি এগিয়ে গিয়েছেন তাঁর যাত্রাপথে—উত্তাল সমুদ্রে ঝড়ঝঞ্ঝার মাঝে বিচক্ষণ নাবিকের মতো। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডে তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছে বহুবার। তবুও অদম্য উৎসাহে তিনি অবিচল থেকেছেন তাঁর সাধনায়।

এইভাবে কঠিন সাধনার পর, ২৭ বছর বয়সে টিল্ডেন টেনিস জগতে পরিচিত হবার সুযোগ পান। ১৯১১ সালে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সুনাম অর্জন করবার পর ১৯১৩ সালে আমেরিকার জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতায় মিক্সড ডাবলস্ বিভাগে বিজয়ী হিসাবে প্রথম পুরস্কার তিনি লাভ করেন। এই সময় প্রথম মহাযুদ্ধে আমেরিকার সৈন্য বিভাগে তাঁকে যোগ দিতে হয়। যুদ্ধের তাণ্ডবতা থেমে গেলে ১৯২২ সালে পেনিসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে পুনরায় তিনি তাঁর প্রিয় খেলার মাঝে সমস্ত সাধনা ঢেলে দেন। আমেরিকার জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতায় ১৯১৮ সালে ডাবলস-এ সাফল্যলাভ করবার পর ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত পর পর তিনবার এবং ১৯২৭ সালে আবার টিল্ডেন তাঁর সহ-খেলোয়াড়ের সঙ্গে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ডাবলস জুটি হিসাবে বিবেচিত হন। সিঙ্গলস-এ ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত পর পর পাঁচ বছর টিল্ডেনকে পরাজিত করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয় না। তিন বছর ব্যবধানে ১৯২৯ সালে আবার টিল্ডেন আমেরিকার চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেন।

এর পর টিল্ডেনের বিজয়-অভিযান আমেরিকার চৌহদ্দি পার হয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা উইম্বিলডন এবং ডেভিস কাপে

গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করার জন্য অগ্রসর হন। উইম্বিলডনের সিঙ্গলস-এ ১৯২০ সাল, ১৯২১ সাল এবং ১৯৩০ সালে যে তিন বছর তিনি বিজয়ী হবার অভিলাষী হয়েছেন, সেই তিন বছরই তাঁর সেই জয়যাত্রার পথে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারেন নি। আমেরিকাবাসী হিসাবেও উইম্বিলডনের পুরুষদের সিঙ্গলস-এর বিজয়ীর তালিকায় তাঁর নামই প্রথম লিখিত হয়েছে।

ডেভিস কাপে ১৯২০ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত আমেরিকার উপর্যুপরি ৭ বছর বিজয়-অভিযানে টিল্ডেন শুধু শ্রেষ্ঠ সেনানী ছিলেন না—ছিলেন অধিনায়ক ও কর্ণধার। এই ৭ বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ধুরন্ধর খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে তাঁকে ১৩টি খেলায় জয়লাভ করতে হয়েছে। মোট ১১ বার ডেভিস কাপের খেলায় যোগদান করবার গৌরব লাভ করে তিনি যে অবিনশ্বর কীর্তি স্থাপন করেছেন তা আজও অমলিন হয়ে গৌরবে মাথা উঁচু করে রয়েছে। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে ডেভিস কাপের খেলায় টিল্ডেন ১৭টি সিঙ্গলস ও ৪টি ডাবলস খেলায় বিজয়ীর মুকুট ধারণ করেছেন।

অবশ্য টিল্ডেনের সাফল্য বা বিজয়-অভিযান শুধুমাত্র আমেরিকা, উইম্বিলডন বা ডেভিস কাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ফ্রান্স, ইটালী, অস্ট্রিয়া, জার্মাণী, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও মধ্যপ্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা-গুলির বিজয়ীর তালিকায় টিল্ডেনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়েছে। ৭৫,০০০ মাইল পথ তিনি এই বিজয়-অভিযানে অতিক্রম করে মোট ৭০টি আমেরিকা ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বিজয়ীর পুরস্কার ঘরে এনে তুলেছেন।

১৯৩১ সালে প্রতিভার সর্বোচ্চ শিখরে থাকা অবস্থায় তিনি পেশাদারী খেলায় যোগদান করে কুড়ি বছর ধরে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। অগণিত দর্শক তাঁর প্রতিটি খেলা দেখার জন্য দিন গুণেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা

তারা অপেক্ষা করেছে খেলা দেখবার আশায়। এক লক্ষ ডলারেরও বেশী তিনি উপার্জন করেছেন এই পেশাদারী খেলা থেকে। টেনিস খেলার বিভিন্ন মোসান পিকচার তুলে, আমেরিকার বিখ্যাত টেনিস খেলার পত্রিকা 'র‍্যাকেটে'র সম্পাদনা করে, বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখে এবং 'মাই-স্টোরি—এ চ্যাম্পিয়ান মেমোরিজ' নামে বহুল প্রচলিত নিজের আত্মজীবনী লিখেও তিনি কম সুনাম ও অর্থ লাভ করেননি। এ ছাড়া, অভিনেতা হিসাবেও টিল্ডেন দর্শকদের মন হরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৫২ সালে নিউইয়র্ক থিয়েটারের 'দি কিউ', 'ড্রাকুলা' ও 'দে গট্ হোয়াট দে ওয়ানটেড' নামক বইতে এবং ১৯৪২ সালে হলিউডে তাঁর নিজের বই 'দি নাইস হারমনস'এ অভিনয় করে তিনি একাধারে যেমন পেয়েছেন অর্থ তেমনি পেয়েছেন যশ।

এক আপত্তিকর প্রবন্ধ লেখার জন্য আমেরিকার 'ন্যাশনাল লনটেনিস এসোসিয়েশন' ১৯২৮ সালে টিল্ডেনকে শৌখিন খেলোয়াড় হিসাবে খেলবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ডেভিস কাপে আমেরিকার অপ্রতিহত জয়লাভের পতাকাকে উড্ডীন রাখবার জন্যে এক বছরের ব্যবধানে আবার টিল্ডেনকে সাদরে আহ্বান করে আনা হয়।

১৯২৩ সালে খেলবার সময়ে এক দুর্ঘটনায় টিল্ডেনের ডান হাতের একটি আঙুলে ভীষণ আঘাত লাগে। আঙুলটি বিষাক্ত হয়ে যাওয়ায় হাতটিকে রক্ষা করবার জন্যে ঐ বিষাক্ত আঙুলটির গোড়া থেকে কেটে বাদ দিয়ে দিতে হয়। এই খবর প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সকল দেশের সকল টেনিস উৎসাহী মানুষের মনে এক বিষাদের মলিন ছায়া নেমে আসে। টিল্ডেনের ছন্দোময়, আবেগবহুল, প্রাণবন্ত খেলা তাঁরা আর দেখতে পাবেন না মনে করে অনেকেই অশ্রু মোচন করেন। কিন্তু টিল্ডেন জন্মেছিলেন এক অবিনশ্বর প্রতিভা নিয়ে। নিত্য নব নব রূপে

প্রকাশিত হবার সঞ্জীবনী মন্ত্রে সেই প্রতিভা ছিল ভাস্বর। তাই নতুন ভঙ্গিমায়, অভিনব র‍্যাকেট ধরবার কৌশলের মাঝে তিনি ফিরিয়ে আনেন তাঁর সেই বহু কষ্টে অর্জিত, বহু সাধনায় গঠিত খেলবার অপূর্ব মূর্ছনা। বাধাবন্ধনহীন জয়-যাত্রার বিস্তীর্ণ পথ ধরে তিনি এগিয়ে চলেন আবার।

দর্শকদের মন জয় করবার মন্ত্র টিল্ডেন জানতেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে থাকতো নৃত্যের ছন্দ, নিখুঁত তালে তা ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হতো। তাঁর প্রতিটি মার মনে হতো যেন সদ্য সৃষ্টি—নবতম নৈপুণ্যের ধারক। দর্শকেরা তাই টিল্ডেন মাঠে নামলে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়তেন—অধীর আগ্রহে ও উন্মাদনায় ভুলে যেতেন তাঁরা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। টিল্ডেনের জনপ্রিয়তার একটি ছোট দৃষ্টান্ত হয়তো এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না—একবার টিল্ডেন উইম্বিলডনে যোগদান করবেন না বলে স্থির করলেন। অনুরোধ আসতে লাগলো উইম্বিলডন থেকে। কাতর অনুনয় এলো বিশ্বের বিভিন্ন টেনিস খেলোয়াড়-দের কাছ থেকে। আমেরিকার জনসাধারণ তাদের প্রিয় খেলোয়াড়ের খামখেয়ালিতে যার-পর-নাই চিন্তিত হলো। সকল রকমের চেষ্টা চলতে লাগলো টিল্ডেনের মনোভাব পরিবর্তন করানোর জন্য। কিন্তু টিল্ডেন অবিচল। শেষে আমেরিকার সভাপতি ওয়ারেন জি. হার্ডিং ছুটে এলেন টেনিস খেলার এই পুরন্দরের কাছে। বন্ধুভাবে টিল্ডেনকে বোঝালেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এ অনুরোধ টিল্ডেন ফেলতে পারলেন না। তাঁর জাহাজ ছাড়লো ইংলণ্ডের পথে নির্দিষ্ট দিনে। টিল্ডেন উইম্বিলডনে পৌঁছুলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন। জয়ী হয়ে দেশে ফিরে এলেন।

দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে টিল্ডেন ছিলেন টেনিস জগতের বিস্ময়। রাজা থেকে প্রজা সকলেই সমান আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতো তাঁর খেলা দেখার জন্য। ভারতীয় লন-টেনিস এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে ১৯৩৭ সালের শেষে টিল্ডেন, কোশে, র‍্যামিলন ও বার্কের

সঙ্গে ভারত সফরে আসেন। ১৯৩৮ সালের ২রা জানুয়ারী কলকাতার সাউথ ক্লাব মাঠে টিল্ডেন ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে এক প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের টেনিস উৎসাহী অগণিত দর্শক টিল্ডেনের খেলা দেখবার আশায় এসে সমবেত হন। স্থানাভাবে বহু দর্শককে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়। যাঁরা মাঠে প্রবেশ করবার সুযোগ লাভ করেন, তাঁরা টেনিস খেলার এই যাদুকরের অপূর্ব বিস্ময়কর খেলায় মুগ্ধ হয়ে যান। কিন্তু টিল্ডেন সব ক'টি খেলায় জয়লাভ করতে পারেন না। বিশ্বের অপর ধুরন্ধর খেলোয়াড় কোশের কাছে তাঁকে হার স্বীকার করতে হয় ২-৬, ৬-৪, ৭-৯, ২-৬ গেমে। এই দুই ধুরন্ধর খেলোয়াড়ের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে ছবি ভারতের টেনিসপ্রিয় দর্শকদের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে তা আজও অমলিন রয়েছে।

অর্থ, সুনাম, যশ, সুহৃদ্, শুভাকাঙ্ক্ষী সবই তিনি পেয়েছেন অযাচিতভাবে। কিন্তু নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় ও উচ্ছৃঙ্খলতায় আবার সবকিছু হারিয়েছেন পথের ধুলোয়। তাই শেষজীবনে তাঁকে কাটাতে হয়েছে এক অপরিচ্ছন্ন জঘন্য হোটেলের আলোবাতাসহীন বদ্ধ ঘরে। ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত হলিউডে ১৯৫৩ সালের ৫ই জুন সেই হৃতসর্বস্ব টেনিস সম্রাটকে মৃত্যু এসে ধীরে ধীরে আলিঙ্গন করে চিরশান্তির কোলে আশ্রয় দেয়।

টিল্ডেনের মরদেহ আজ পৃথিবীতে নেই সত্য কিন্তু বিশ্বের প্রতিটি টেনিস মাঠে, প্রত্যেকটি দর্শক ও খেলোয়াড়ের উজ্জ্বল স্মৃতির মাঝে টিল্ডেন চিরজীবী—তাঁর প্রতিভা ও ক্রীড়ানৈপুণ্য চিরশাশ্বত।
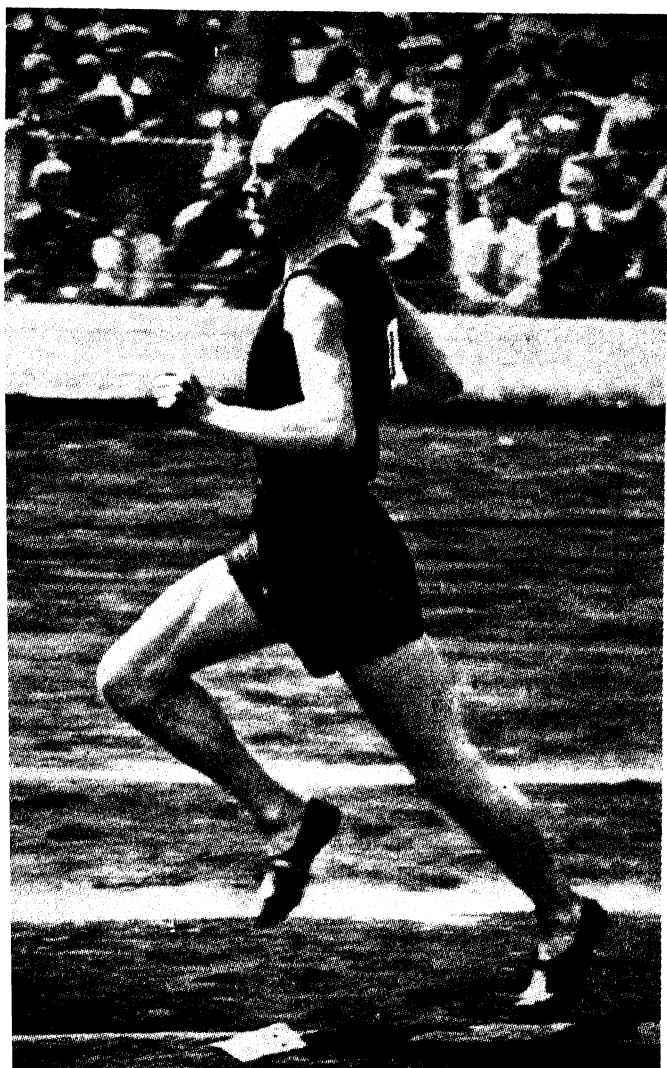
দূরপাল্লার স্মরণীয় দৌড়বীর পাভো নুরমী

## পাভো নুরমী

বর্তমান বিশ্বের খেলাধুলার শ্রেষ্ঠ আসর অলিম্পিকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন সব বিস্ময়কর প্রতিভার সন্ধান মেলে যাঁদের কাহিনী রূপকথার মতই পড়তে ইচ্ছে করে। দৌড়বীর পাভো নুরমী তাঁদের অন্যতম। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দৌড়বীরদের প্রতিষ্ঠিত সময়ের সীমারেখাকে বারে বারে উপেক্ষা করে নুরমী এগিয়ে গিয়েছেন জয়-যাত্রার বিজয়কেতন উড়িয়ে। ১৯২০ সালে এ্যাণ্টওয়ার্পে, ১৯২৪ সালে প্যারিসে এবং ১৯২৮ সালে আমষ্টার্ডাম অলিম্পিকের ইতিহাসের পাতায় তাঁর সাফল্যের কাহিনী লিখিত হয়েছে। এই তিনটি অলিম্পিকে দূরপাল্লার দৌড়ের ৬টি বিভাগে প্রথম স্থান ও ৩টি বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে যে অবিস্মরণীয় কীর্তি তিনি অর্জন করেছেন তা অন্য কোন এ্যাথলেটের পক্ষে আজো লাভ করা সম্ভব হয়নি। ৯টি বিভাগে সাফল্যের কথা দূরে থাক, অলিম্পিকের ইতিহাসে ৯টি বিভাগের ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সুযোগই বা কে লাভ করেছেন ? নুরমীর কোন রেকর্ড অবশ্য আজ গৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে নেই। কিন্তু এক সময় তিনি এ্যাথলেটিকে যে কীর্তি স্থাপন করে গেছেন, বিশ্বের সকল এ্যাথলেট আজও শ্রদ্ধানত মস্তকে তা স্মরণ করে।

নুরমীর দীর্ঘ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা সাধারণ মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। ১৯২৪ সালে প্যারিস অলিম্পিকে মাত্র এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দৌড়বীরদের পশ্চাতে ফেলে ১,৫০০ ও ৫,০০০ মিটার দূরত্বের দৌড় জয় করে তিনি তাঁর প্রথম বিস্ময়কর প্রতিভার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। দীর্ঘ ১১ বছর ধরে দূরপাল্লার দৌড়ে একের পর এক বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তিনি। আজ যে রেকর্ড করেছেন কাল হয়ত আবার নিজেই সেটা ভেঙ্গেছেন। এমনি ভাঙ্গাগড়ার খেলা করেই তাঁর কেটেছে দীর্ঘকাল। দূরপাল্লার

দৌড়ের যেখানে যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে, নুরমী সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন—জয় করেছেন—ফিরে এসেছেন বিজয়ীর জয়মাল্য পরে, এই হলো তাঁর সাফল্যের সহজ ও সরল ব্যাখ্যা।

দৌড়ের অসংখ্য প্রতিযোগিতায় দীর্ঘদিন ধরে জয়ের উপর জয়লাভ করলেও কখনও কেউ তাঁকে ক্লান্ত বোধ করতে দেখেনি। প্রত্যেকটি দৌড়ের পর তাই তাঁকে বলতে শোনা গেছে, "আগামী দৌড়ে আমি আরও ভালো করবো।" এত অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। মানুষ স্বকীয় সাধনায় দৌড়ের সময়কে দিনের পর দিন উন্নত করতে পারে, একথা নুরমীর জীবনী পাঠ করলেই বিশেষ করে জানা যায়। প্রত্যেকটি দৌড়ে নিজের সময়কে উন্নত করবার জন্যে তিনি 'ষ্টপ ওয়াচ' ব্যবহার করতেন। পা দুটি ছিল যেন তাঁর যন্ত্রচালিত। দেহ বা মনে ছিল না কোন ক্লান্তি বা অবসাদ। ঘড়ির সময় দেখে তিনি বাড়াতেন তাঁর সেই ক্লান্তিহীন, অবসাদশূন্য পা দুটির গতি। দৃঢ় মনোবল আর অফুরন্ত প্রাণশক্তি তাঁকে জয়ের পথে চালিত করে নিয়ে যেত। অনেক ব্যঙ্গ ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে এই 'ষ্টপ ওয়াচ' ব্যবহার করার জন্যেই, কিন্তু সেই ব্যঙ্গ ও পরিহাসকারীরাই নুরমীর সাফল্যের পর তাঁকে দেখবার আশায় অপেক্ষা করেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রত্যেকটি দৌড়ে নতুন নতুন জুতো ব্যবহার করা ছিল নুরমীর এক অদ্ভুত খেয়াল। ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বের দৌড়ে ভিন্ন ভিন্ন রঙের জুতো তিনি ব্যবহার করতেন। রঙীন জুতোর রঙীন নেশায় শুধু নুরমীই মাতাল হয়ে জয়লাভের পথ প্রশস্ত করতেন না—দর্শকদেরও মাতাল করে তুলতেন তাঁর বিস্ময়কর দৌড়ের অপূর্ব ভঙ্গিমায়। নুরমীর দৌড়ের ষ্টাইল ছিল সত্যই অপূর্ব। নুরমী ছিলেন ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসী আর তাঁর দৌড়ে ছিল ঝড়ের গতি। তাই নুরমীকে অনেকে 'ফ্লাইং ফিন' নামে অভিহিত করতো।

ফিনল্যাণ্ডের অন্তর্গত হেলসিঙ্কি থেকে কয়েক মাইল দূরে 'এবো' নামক জায়গায় তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকেই দৌড়োতে তিনি

ভালবাসতেন। ৯ বছর বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে দৌড়ানোর প্রতিভা দেখা দিতে থাকে। এই সময়ে ট্রলি গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ে তিনি বন্ধুদের বিস্ময়ের উদ্রেক করেন। ১২ বছর বয়সে হঠাৎ তাঁর পিতার মৃত্যু হওয়ায় বড় ছেলে হিসাবে সংসারের সকল দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর মাথায়। গরীব পরিবারের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করতে দিনরাত তাঁকে পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু নুরমীর মনোবল আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মত ছিল না। দৌড়ানোর নেশা ছিল তাঁর শিরায় শিরায়—রক্তের প্রতি বিন্দুতে। সেই তীব্র নেশায় উন্মাদ নুরমী সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করবার পরও রাতের আঁধারে একাকী দৌড়ের অনুশীলন করতেন। জনহীন মাঠে বা বনের ধারে সঙ্গিহীন অবস্থায় নুরমী মাইলের পর মাইল দৌড়ে যেতেন। নিজেকে সকল-প্রকার প্রলোভন ও নেশা থেকে মুক্ত করবার জন্য তিনি কঠোর সংযম অভ্যাস করতেন। মাছ, মাংস, মদ, সিগারেট, এমনকি সিনেমা থিয়েটার তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি।

দীর্ঘ ছয় বছর ঐরূপ কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে তাঁর সাধনা চলে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোনদিন কোন প্রতিযোগিতাতেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন না। দূরপাল্লার দৌড়ে বিশ্বজয়ীর সম্মানলাভ করতে হলে নিজের শরীরকে সুগঠিত করে কঠিন পরিশ্রম সহ্য করবার শক্তি আয়ত্ত্ব করতে হয়, একথা বিশেষ করেই তিনি জানতেন। ১৯১৯ সালে ফিনল্যাণ্ডের সৈন্য বিভাগে যোগদান করেও তিনি তাঁর নিয়মিত দৌড়ানোর অনুশীলন চালিয়ে যান। বিভিন্ন দূরত্বের দৌড়ের মধ্যে ৫,০০০ মিটার ও ১০,০০০ মিটার দৌড়ই ছিল নুরমীর প্রিয়! ক্রমে ঐ দুই দূরত্বের দৌড়ে তাঁর নাম ফিনল্যাণ্ডের সীমানা পার হয়ে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯২০ সালে এ্যাণ্টওয়ার্প অলিম্পিকে ফিনল্যাণ্ডের হয়ে নুরমী প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদানের সুযোগ পান। ৫,০০০ মিটার দৌড়ের শেষ সীমানায় খ্যাতনামা দৌড়বীর জে. গুইলমটের কাছে পরাজিত হয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করলেও ১০,০০০ মিটার

দৌড়ে গুইলমটের বিরুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন তিনি। নুরমীর নাম বিশ্বের সকল দৌড়বীরদের কাছে আগ্রহের সৃষ্টি করে। কিন্তু ১৯২৪ সালে প্যারিস অলিম্পিকে নুরমী দৌড়ের যে ইতিহাস সৃষ্টি করেন, সেই ইতিহাস শুধু নুরমীর কাছেই স্মরণীয় হয়ে থাকে না—বিশ্বের খেলাধুলা উৎসাহী সকল জনগণের মনের মণিকোঠায় অমর হয়ে থাকে। মাত্র এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ১,৫০০ মিটার দৌড় ৩ মিনিট ৫৩$\frac{৩}{৫}$ সেকেণ্ডে এবং ৫,০০০ মিটার দৌড় ১৪ মিঃ ৩১$\frac{১}{৫}$ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে তিনি একধারে যেমন উভয় প্রতিযোগিতায় নূতন অলিম্পিক রেকর্ডের সৃষ্টি করেন, অন্যদিকে এক ঘণ্টার মধ্যে ঐ দুই দূরত্বের দৌড়ে বিজয়ী হিসাবে তাঁর নাম অলিম্পিকের ইতিহাসে প্রথম লিখিত হয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। তখনও ১০,০০০ মিটার দৌড় ও ৩,০০০ টিম রেস বাকী। তাই ফ্লাইং ফিন যখন সে দুটি দৌড়েও প্রথম স্থান অধিকার করেন তখন সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। ৩,০০০ মিটার দৌড়ের সময়ও ৮ মিঃ ৩২ সেকেণ্ড হওয়ায় আর একটি অলিম্পিক রেকর্ডের সৃষ্টি হয়। ফলে, সপ্তম অলিম্পিকে চারটি স্বর্ণপদক ও তিনটি অলিম্পিক রেকর্ডের অধিকারী হন নুরমী।

এই অপূর্ব সাফল্যের পর নানা দেশ থেকে নুরমীর কাছে দৌড়োনোর আহ্বান আসতে থাকে। ১৯২৫ সালে নুরমী দৌড়-বীরের দেশ আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করেন। বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী দৌড়বীরদের সঙ্গে তাঁর দৌড়ের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম দিনের প্রতিযোগিতাতেই নুরমী বিশ্বরেকর্ডের সৃষ্টি করে বিজয়ী হন। দ্বিতীয় দিন সকালবেলা আর এক দূরত্বের দৌড়ের ব্যবস্থা করা হয়। নুরমী অবতীর্ণ হন, দৌড় শেষ করেন; দেখা যায় সেই দৌড়েও অপরাজিত নুরমীর সময় আর একটি বিশ্বরেকর্ডের সৃষ্টি করেছে। তৃতীয় দিন ঠিক একইভাবে আর একটি বিশ্বরেকর্ডের সৃষ্টি

করেন তিনি। এইভাবে প্রথম তিন দিনের তিনটি প্রতিযোগিতাতে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করে তিনি সমস্ত আমেরিকাবাসীর মন জয় করে নেন। কিন্তু এই তিন দিনের সাফল্য তো ছিল তাঁর মুখবন্ধ। এর পর চললো তাঁর বিজয়-অভিযান আমেরিকার দিকে দিকে। আজ চিকাগোতে, কাল নিউইয়র্কে, পরশু আরও হাজার মাইল দূরে নুরমী দৌড়ের পর দৌড় জয় করে চলেন। তিনিই প্রথম মানুষ যিনি এই সফরে এসে তুই মাইল দূরত্বের দৌড় নয় মিনিটেরও কম সময়ে অতিক্রম করবার কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৬টি বিশ্বরেকর্ড ও ৩৮টি বিভিন্ন ট্রাক রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে পাভো নুরমী যখন আমেরিকা অভিযান শেষ করে দেশে ফিরে আসেন, তখন দূরপাল্লার দৌড়বীর বলতে বিশ্ববাসী একটি লোকের নামই উচ্চারণ করতে থাকে এবং সে নামটি নুরমী ছাড়া আর কারোই নয়।

তিন বছর পরে ১৯২৮ সালে আমস্টার্ডাম অলিম্পিকে নুরমী যখন অবতীর্ণ হন তখন দূরপাল্লার দৌড়ানোর বয়সের প্রায় শেষ সীমানায় এসে তিনি পৌঁছেছেন। কিন্তু অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার নুরমী তখনও বিশ্বের বিস্ময়; তাই ১০,০০০ মিটার দৌড় মাত্র ৩০ মিনিট ১৮$\frac{8}{10}$ সেকেণ্ডে তিনি অতিক্রম করে অগণিত দর্শকের অভিনন্দন লাভ করেন—সৃষ্ট হয় আর এক অলিম্পিক রেকর্ড। ৫,০০০ মিটার দৌড়েও তিনি সুরু থেকে এগিয়ে যান সকলকে অতিক্রম করে। কিন্তু দৌড়ের শেষ সীমার দিকে যখন নুরমীর স্বাভাবিক গতি বৃদ্ধি না হয়ে শ্লথ হতে থাকে, ঘন ঘন তিনি যখন পিছন ফিরে চাইতে থাকেন, তখন সাধারণ দর্শকদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী রিটোলাই শেষ পর্যন্ত নুরমীকে পেছনে ফেলে সীমা-রেখার ফিতা স্পর্শ করেন। দৌড় শেষ হবার পর অগণিত দর্শকের প্রশ্নবাণে জর্জরিত নুরমী উত্তর দেন, 'রিটোলা আমার বন্ধু ও স্বদেশবাসী—তার কাছে পরাজিত হওয়া কিছু অগৌরবের নয়।' ৩,০০০ মিটার ষ্টিপিল চেজেও নুরমী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

এইভাবে অলিম্পিকে ৬টি স্বর্ণপদক ও ৩টি রৌপ্যপদক তাঁর করায়ত্ত হয়। দৌড়ে নব ইতিহাস রচয়িতা হিসাবে নুরমী বিশ্ববাসীর কাছে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকেন।

বিশ্বক্রীড়াক্ষেত্রে নুরমী তাঁর নিজস্ব প্রতিভায় যেমন ফিনল্যাণ্ডকে গৌরবান্বিত করেছেন, ঠিক তেমনি স্বদেশবাসী জনসাধারণ ও রাষ্ট্র নুরমীকে উপযুক্ত সম্মান দিতে কার্পণ্য করেন নি। ফিনল্যাণ্ডের ঘরে ঘরে গৃহদেবতার মত আজ তাঁর নাম। জাতীয় বীর হিসাবে তাঁর নামই প্রথম উচ্চারণ করা হয়। রাষ্ট্রের কাছ থেকে তাঁর অমর প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবে 'অর্ডার অব্ হোয়াইট রোজ' পদবী এবং 'গোল্ড মেডেল অব্ মেরিট' পদক তিনি লাভ করেছেন। ফিনল্যাণ্ডের রাজধানীর রাজপথের সবচেয়ে জনাকীর্ণ স্থানে দেশের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর 'আলটোনান' দিনের পর দিন পরিশ্রম করে নুরমীর যে ব্রোঞ্জ মূর্তি তৈরী করেছেন, সেই মূর্তিকে অতিক্রম করে যাবার সময় দেশ-বিদেশের অসংখ্য দর্শক মস্তক অবনত করে তাঁদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করে নুরমীর উদ্দেশ্যে। বিশ্বের ক্রীড়ারসিকদের কাছে আজও তিনি সমভাবে বন্দিত। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের উদ্যোক্তারা নুরমীর উপর পূতাগ্নির দ্বারা অলিম্পিক দীপশিখা প্রজ্বলিত করবার ভার অর্পণ করে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। নুরমীর দৌড়ের দিন অবশ্য শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আজও তিনি দৌড়ের পাগল। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত নুরমী যে বিশ্বরেকর্ডগুলি সৃষ্টি করেছিলেন সেগুলি হলো—

১৯২১ সালে—

৬ মাইল দৌড়—২৯ মিঃ ৪১·৪ সেঃ

১০,০০০ মিটার দৌড়—৩০ মিঃ ৪০·২ সেঃ

১৯২২ সালে—

৫,০০০ মিটার দৌড়—১৪ মিঃ ৩৫·৪ সেঃ

২,০০০ মিটার দৌড়—৫ মিঃ ২৬·৩ সেঃ

৩,০০০ মিটার দৌড়—৮ মিঃ ২৮·৬ সেঃ

১৯২৩ সালে—

১ মাইল দৌড়—৪ মিঃ ১০'৪ সেঃ

৩ মাইল দৌড়—১৪ মিঃ ১১'২ সেঃ

১৯২৪ সালে—

৪ মাইল দৌড়—১৯ মিঃ ১৫'৬ সেঃ

৫ মাইল দৌড়—২৪ মিঃ ৬'২ সেঃ

১,৫০০ মিটার দৌড়—৩ মিঃ ৫২'৬ সেঃ

৫,০০০ মিটার দৌড়—১৪ মিঃ ২৮'২ সেঃ

১০,০০০ মিটার দৌড়—৩০ মিঃ ৬'২ সেঃ

সন্তরণ সম্রাজ্ঞী ফ্লোরেন্স চ্যাডউইক

# ফ্লোরেন্স চ্যাডউইক

সন্তরণ ইতিহাসে সন্তরণ সম্রাজ্ঞী নামে যিনি পরিচিত, তিনি হলেন ফ্লোরেন্স চ্যাডউইক। তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার কীর্তি-গাঁথা খেলা-ধুলার ইতিহাস গর্বভরে বুকে করে রেখেছে। স্বল্প দূরত্বের সাঁতারেই তাঁর নৈপুণ্য সীমাবদ্ধ থাকেনি, তাঁর সাঁতারের কলাচাতুর্য প্রকাশ পেয়েছে নদ, নদী, খাল, প্রণালী, সাগর, উপসাগরের উত্তাল তরঙ্গের মাঝে। দূরপাল্লার সাঁতারে একের পর এক ইতিহাস সৃষ্টি করে তিনি মানুষের মন জয় করে গেছেন। নিশ্চিত মৃত্যু জেনে যে সব বিপদসঙ্কুল সাঁতারে মানুষ এগুতে সাহস করেনি, ফ্লোরেন্স চ্যাডউইক দৃঢ় মনোবল ও নিজের শক্তির উপর অবিচল আস্থা রেখে অবলীলাক্রমে হাসিমুখে সেই সব কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। স্বকীয় সাধনায় অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়, একথা তাঁর সাফল্যের খতিয়ান থেকেই চোখে পড়ে। দূরপাল্লার সাঁতারে ফ্লোরেন্সের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি রেকর্ড আজও গৌরবে মাথা উঁচু করে রয়েছে।

১৯১৮ সালের ৯ই নভেম্বর ফ্লোরেন্স মে. চ্যাডউইক আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত স্যানডিয়াগোতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রিচার্ড উইলিয়াম চ্যাডউইক পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্মচারী ছিলেন। ফ্লোরেন্সের মায়ের নাম ছিল মেরী চ্যাডউইক। স্যানডিয়াগোর 'পয়েণ্ট লোমা জুনিয়ার স্কুলে' তাঁর শিক্ষা সুরু হয়। ১৯৩৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাবার যোগ্যতা তিনি লাভ করেন। স্কুলের ছাত্রী অবস্থায় তিনি ছাত্রী সমিতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করতে সমর্থ হন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপাধি লাভ করে ফ্লোরেন্স কিছুদিন আইন অধ্যয়ন করলেও আইনের জটিল তথ্যগুলির মধ্যে তিনি রসের সন্ধান পান না। ফ্লোরেন্স ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে কম্পটোমিটার অপারেটার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

খুব ছোটবেলায় ফ্লোরেন্স সাঁতার শিখেছিলেন। ফ্লোরেন্সের কাকা মাইক-ল্যাকোই তার সাঁতারের শিক্ষাগুরু। মাত্র ৬ বছর বয়সে ফ্লোরেন্সকে এক সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যায়। জীবনের এই প্রথম সাঁতার প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করতে না পারলেও এই সাঁতারের মধ্যেই তাঁর সুপ্ত প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কঠিন অনুশীলনের মাঝে ফ্লোরেন্সের মাসের পর মাস কেটে যায়। একের পর এক কয়েকটি নতুন বছর এসেও বিদায় নিয়ে যায়।

মাত্র ১০ বছর বয়সে ফ্লোরেন্স স্যানডিয়াগো উপসাগরের মুখে চ্যানেল সাঁতারে বিজয়িনী হয়ে তাঁর প্রতিভার প্রথম পরিচয় দেন। এই প্রতিযোগিতার ইতিহাসে বিজয়ীর তালিকায় সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠা প্রতিযোগিনী হিসাবে তাঁর নাম লিখিত হয়। এর পর 'লা জে লার' বিখ্যাত আড়াই মাইল সাঁতারে দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ সাঁতারুদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়িনী হওয়ায় আমেরিকার ঘরে ঘরে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৩ বছর যখন তাঁর বয়স পোরেনি তখন আমেরিকার জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ব্যাক ষ্ট্রোকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় আমেরিকার সন্তরণ জগতে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু ফ্লোরেন্সের ভালো লাগতো না এই স্বল্প পাল্লার সাঁতারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। তাঁর মন চাইতো সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার সঙ্গে দোল খেতে খেতে এগিয়ে যেতে। বিরামহীন বিশ্রামহীন সাঁতারে এগিয়ে যাবেন তিনি মাইলের পর মাইল, পাগলা ক্ষেপা ঢেউগুলো এসে যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করতে থাকবে, আর পাগলের প্রলাপের মতই সেই ঢেউগুলোকে উপেক্ষা ক'রে হাসিমুখে এগিয়ে যাবেন তিনি দূরে—আরও দূরে; এই ছিল তাঁর মনের গহন কোণের একান্ত বাসনা। তাই স্বল্প দূরত্বের সাঁতারের বিজয়ীর তালিকায় ফ্লোরেন্সের নাম কখনো দেখা যায়নি। ফ্লোরেন্সের এই মনোবৃত্তির জন্য তাঁর

বিশ্বজয়ী মল্লবীর বড় গামা

সন্তরণ শিক্ষক তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একেবারে হাল ছেড়ে দেন। আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও অসন্তোষের গুঞ্জরন। কিন্তু ফ্লোরেন্সের মনোবল আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মত ছিল না, তাই ঐসব সমালোচনা বা অবজ্ঞায় তিনি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে বাড়ির কাছে সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে মিতালি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীলন করতে থাকেন। কঠিন সাধনা ছাড়া সন্তরণজগতে যে স্মরণীয় হওয়া যায় না, একথা তিনি ভালো করেই জানতেন বলে বলেছেন, "Winners never quit ; quitters never win"। লা-জোলার বিখ্যাত আড়াই মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতায় দেশ-বিদেশের বিখ্যাত পুরুষ সাঁতারুদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ১০ বছর বয়সে যিনি বিজয়ীর পুরস্কার ঘরে তুলেছিলেন, পরবর্তী ১৮ বছরের মধ্যে মাত্র ৮ বছর বিজয়ীর পুরস্কার তাঁর হাতছাড়া হতে দেখা যায়। সামুদ্রিক ম্যারাথন সাঁতারেও তিনি সাতবার বিজয়িনী হন। দূরপাল্লার সন্তরণে ফ্লোরেন্স চ্যাডউইকের জয়ডঙ্কা বাজতে থাকে আমেরিকার দিকে দিকে। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে সাঁতারে তিনি হয়ে পড়েন অপরাজেয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ফ্লোরেন্স তাঁর সাঁতারের কলা-কৌশল দেখিয়ে সৈনিকদের হাসপাতালের সাহায্যের জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে শৌখিন সাঁতারে জনচিত্ত জয় করে ১৯৪৫ সালে তিনি গ্রহণ করেন পেশাদার বৃত্তি। হলিউডের মেট্রোগোল্ড্উইন মেয়ারের একখানি বইতে এস্থার উইলিয়ামের সঙ্গে তাঁকে পর্দায় অবতরণ করতে দেখা যায়। কায়ার মত ছায়াতেও অগণিত দর্শকের মনোহরণ করতে তাঁর একটুও দেরি হয় না। এর পর পেশাদার সন্তরণ শিক্ষয়িত্রী হিসাবে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন।

কিন্তু প্রচুর অর্থাগমে ফ্লোরেন্সের মন ভরে না। সন্তরণ-ইতিহাসে নিজ প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য রেখে যাবার জন্য তাঁর মন আকুলিবিকুলি করতে থাকে। কিছুদিন পর ফ্লোরেন্সের মায়ের মুখ থেকে জনসাধারণ জানতে পারে যে, তাঁর কন্যা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে

ফ্লোরেন্স চ্যাডউইকের দেহ। প্রথমবারের সময় থেকে আরও কম সময়ে ফ্লোরেন্স এশিয়া থেকে ইউরোপে অবলীলাক্রমে সাঁতার কেটে চলে আসেন।

একে একে যতই কঠিনতম দূরপাল্লার সাঁতারে সাফল্য লাভ করতে থাকেন ততই আরও সাফল্য, আরও সুনামের জন্য সেই সুন্দরী সন্তরণপটীয়সীর অতৃপ্ত বাসনা তৃপ্তির পথ খুঁজে বেড়াতে থাকে। যে সমুদ্রে তরঙ্গদোলার মাঝে ফ্লোরেন্সের জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কেটে গেছে, যে উত্তাল তরঙ্গমালার বুকে নিজের বুক রেখে দিনের পর দিন তিনি জানিয়েছেন তাঁর দুর্বার বাসনার কথা—সেই অগণিত তরঙ্গরাজি নিয়ত আহ্বান করতে থাকে তাদের প্রিয় সখীকে। আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরের মত পৃথিবীর বৃহত্তম দুটি মহাসাগরকে যুক্ত করেছে জিব্রাল্টার প্রণালী। জিব্রাল্টারের ফেনিল বিক্ষুব্ধ মূর্তি মানুষকে যুগে যুগে ভীত সন্ত্রস্ত করেছে। সেখানে অসংখ্য হাঙ্গর কুমীরের দল শিকারের আশায় বিরাট ব্যাদান মুক্ত করে ঘুরে বেড়ায়। সেই ভয়সঙ্কুল জিব্রাল্টারের মধ্য দিয়ে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত সাঁতার কাটবেন বলে ঘোষণা করেন চ্যাডউইক। ১৯৫৩ সালে সেই রোমাঞ্চকর ভয়াবহ সাঁতারে যেদিন তিনি সাফল্য লাভ করেন, সেইদিন সারা বিশ্ব অবনত মস্তকে সন্তরণ-সম্রাজ্ঞী হিসাবে তাঁকে স্বীকার করে নেয়। একদিন যিনি সন্তরণে অপটু বলে শিক্ষক, আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের পেয়েছিলেন উপেক্ষা, তিনি আবার তাঁদের গর্বের পাত্রী হয়ে ওঠেন। শুধু তাঁদেরই নয়—সারা আমেরিকা সেই গর্বে গর্বিত হয়।

মানুষ যুগে যুগে ফ্লোরেন্স চ্যাডউইকের বিস্ময়কর সন্তরণ-প্রতিভার কথা শ্রদ্ধানতচিত্তে স্মরণ করতে বাধ্য হবে—বাধ্য হবে তারা আগামী দিনের আগন্তুকদের কাছে তাঁর অমর প্রতিভার কথা রূপকথার কাহিনীর মত প্রচার করতে। দূরপাল্লার সাঁতারে ফ্লোরেন্স চ্যাডউইক অদ্বিতীয়া, অমর, অবিস্মরণীয়া।

মুষ্টিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় ইতিহাসস্রষ্টা হেনরী আর্মষ্ট্রং

## হেনরী আর্মস্ট্রং

মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে যুগে যুগে অনেক প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে। অনেক কীর্তি অনেক যশ কুড়িয়ে গেছেন তাঁরা। কিন্তু সেই স্বাভাবিক আসা-যাওয়ার মাঝেও দু-একটি অবিস্মরণীয় প্রতিভা মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসকে রূপে, রসে, বর্ণে এমন আলোকিত করে গেছে যা কোনদিনই বিস্মৃতির গর্ভে স্থানলাভ করবে না, ভুলতে পারবে না কোন দিনের কোন মানুষ সেই অমর প্রতিভাকে।

মুষ্টিযুদ্ধে বিশ্ববিজয়ীর সম্মান সহজলভ্য নয়। শৌখিন মুষ্টিকদের মধ্যেই সেই প্রতিযোগিতা কখনো সীমাবদ্ধ থাকেনি। অর্থ ও যশের যৌথমিলনে গড়া বিজয়ীর জয়মাল্য লাভ করতে দীর্ঘদিনের প্রাণপাত পরিশ্রমের যেমন প্রয়োজন, তেমনি নিরলস সাধনার মাধ্যমে শক্তিশালী বাহুর বজ্রসম মুষ্ট্যাঘাতের কৌশল আয়ত্ত করা অপরিহার্য।

কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে একদিন এমন এক বিস্ময়কর প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছিল, যিনি শুধু একটি বিভাগে নয়, ফেদার ওয়েট, ওয়েল্টার ওয়েট এবং লাইট ওয়েট, এই তিনটি বিভাগেই বিশ্ববিজয়ীব মুকুট লাভ করেছিলেন। মাত্র ১২ মাস সময়ের মধ্যে সেই অবিশ্বাস্য সম্মানের অধিকারী হয়ে সারা বিশ্বকে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন তিনি। তিনটি বিভাগে বিশ্ববিজয়ী হিসাবে আজও অন্য কোন নাম যুক্ত হয়নি তাঁর পাশে। জানি না, ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভ থেকে আবার এমনি কোন প্রতিভার আবির্ভাব ঘটবে কি না।

বাল্যের অধিকাংশ দিনগুলি কেটে গেছে তাঁর অনাহারে, অনিদ্রায়, আশ্রয়হীন অবস্থায়। কৈশোরের সুন্দর মুহূর্তগুলি কখন এসে যে বিদায় নিয়ে গেছে তা তাঁর জানা নেই। শিক্ষার আলোক স্পর্শ করেনি তাঁর অঙ্গ। মুষ্টিযুদ্ধের হাতেখড়ি তাঁর গুরুর কাছে বা গুরুগৃহে হয়নি, নিতান্ত অন্ন-সংস্থানের তাগিদে তিনি মুষ্টিযুদ্ধকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে দুর্বার

আক্রমণের সাহায্যে তাঁকে এগিয়ে যেতে হয়েছে জয়যাত্রার পথে। একাগ্র ও একান্ত সাধনায় বিশ্ববিজয়ীর মুকুট পরেছেন তিনি একে একে। সেই অবিস্মরণীয় প্রতিভা—মুষ্টিকের নাম হেনরী আর্মষ্ট্রং। নিগ্রো জাতির গৌরব তিনি।

আমেরিকার মিসৌরী রাজ্যের সেণ্ট লুই শহরের প্রান্তে এক কদর্য আলোবাতাসহীন পর্ণশালায় হেনরীর জন্ম হয়। দিনটি ছিল ১৯১২ সালের ১২ই ডিসেম্বর। এক অতি দরিদ্র পরিবারের ত্রয়োদশ সন্তান তিনি। নিয়মিত আহার বা দুবেলা আহারের প্রশ্নই উঠতো না সেই সংসারে। কোন্ দিন কি জুটবে কেউ তা জানতো না। মাত্র ১৩ বছর বয়সেই হেনরীকে অর্থের সন্ধানে জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। অতি সামান্য অর্থের জন্য তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হতো। তবুও সেই অর্থ ছিল এতই সামান্য যে তাতে একজন লোকেরও নুন ভাতের সংস্থান করা সম্ভব হতো না।

ক্ষুধার তীব্র জ্বালা এবং নিয়ত দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত সংসারের দৃশ্য হেনরী আর সহ্য করতে পারেন না। বেরিয়ে পড়েন তিনি ঘর ছেড়ে। কাজের সন্ধানে শহরের পথে পথে তাঁকে ঘুরতে হয় দিনের পর দিন। ট্রেণে টিকিট কেটে উঠবার ক্ষমতা নেই। চাকরির চেষ্টায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হলে ট্রেণের বাহিরে পাদানিতে দাঁড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে তাঁকে যেতে হয়। অভুক্ত, ক্লান্ত হেনরী ঐভাবে ট্রেণের পাদানিতে ঝুলতে ঝুলতে শীতল হাওয়ার স্নেহস্পর্শে ঘুমিয়ে পড়েন একদিন। ঘুমের ঘোরে তাঁর হাত শিথিল হয়ে পড়ে। আর্মষ্ট্রং গড়িয়ে পড়েন বিদ্যুৎবেগে ধাবিত রেলগাড়ির পাশে। কিন্তু ক্রীড়াক্ষেত্রের এই বিরাট প্রতিভা অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে যায় এটা বিধাতার অভিপ্রেত ছিল না; তাই যমের দূতকে হেনরীর শিয়রে এসেও ফিরে যেতে হয়। হেনরীর জীবননাশের আর এক প্রচেষ্টাও দৈব-কৃপায় ব্যর্থ হয়। একদিন এক রেল পুলিশ গভীর রাতে ট্রেণের পাদানিতে হেনরীকে

ঝুলতে দেখে চোর বা ডাকাত সন্দেহে গুলী করে, কিন্তু সেই গুলীও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

আহার নেই। বাসস্থান নেই। ভবিষ্যতের কোন আশা নেই। তবুও সেই নিগ্রো বালকের দেহে আসে যৌবন। হেনরীর সুঠাম সুগঠিত দেহ লোকে দাঁড়িয়ে দেখে। ভবঘুরে জীবন। ঘুরতে ঘুরতে হেনরী এসে উপস্থিত হন প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্রকূলে। এখানকার আবহাওয়ায় তাঁর দেহের রং আরও ঘন কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়। অন্য কোন কাজ যোগাড় করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত হেনরী জুতো পালিশের কাজ সুরু করেন। কিন্তু এই কাজেও সুবিধা হয় না। রাজপথের দুধারে জুতো পালিশ করা ছেলের অভাব নেই। কোন একজন লোক জুতো পালিশ করতে এলে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে তারা। নিজেদের মধ্যে কলহ ও মারামারি হয় প্রতি মুহূর্তেই খরিদ্দারের দখল নিয়ে। হেনরীকে এই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। কখনও কয়েকজনের বিরুদ্ধে তাঁকে একাই লড়তে হয়। কিন্তু হেনরীর দু-চারটের বেশী ঘুষি কেউই হজম করতে পারে না। স্বল্পভাষী হেনরী যখন বুক ফুলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে চীৎকার করে বলেন, 'সাহস থাকে তো এগিয়ে আয় একে একে', তখন সব সরে পড়ে ধীরে ধীরে। হেনরীর মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষার এইভাবেই হাতেখড়ি।

১৯৩১ সালে সেণ্ট লুই থেকে পাকাপাকি ভাবে লস এঞ্জলসে চলে আসেন হেনরী। একদিন এক জায়গায় অনেক লোকের হৈ-চৈ শুনে ভিড়ের মধ্যে তিনি ঢুকে পড়েন। চেয়ে দেখেন এক মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা হচ্ছে। রক্তের মধ্যে তাঁর উদ্দাম নৃত্যের সুরু হয়। মুষ্টিক দুজনকে অনুপ্রাণিত করবার জন্যে দর্শকদের উচ্চ চীৎকার তাঁর মনে এক নব শিহরণ জাগায়। অন্তরের অন্তস্তল থেকে কার আহ্বান যেন তাঁর কানে আসে—'হেনরী তুমিও জন্মেছো ঠিক ঐভাবে দর্শকদের অভিনন্দন কুড়োতে, তোমাকেও একদিন হতে হবে ওদের থেকে আরও বড়, অজেয় অমর মুষ্টিযোদ্ধা'।

কুড়ি বছর বয়স হবার কিছু আগেই হেনরীকে প্রথম মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। অবশ্য, ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তাঁর লড়াইয়ের সম্পূর্ণ ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব না হলেও ১৯৩৬ সালে ১১টি মুষ্টিযুদ্ধে বিজয়ী ও মাত্র ৩টিতে তিনি পরাজিত হন। ১৯৩৭ সালে উপর্যুপরি ২৬টি প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রত্যেকটিতে প্রতিপক্ষকে ভূতলশায়ী করার ফলে তাঁকে 'হোমিসাইডহ্যাঙ্ক' ও 'হ্যামারিং হ্যাঙ্ক' নামে অভিহিত করা হয়। একের পর এক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি বিজয়ীর জয়রথ চালিয়ে এগিয়ে যান। নিউইয়র্ক, মেক্সিকো, লণ্ডন, প্যারিস বা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের যেখান থেকে যখনই কোন আহ্বান এসেছে, তিনি তখনই গিয়ে হাজির হয়েছেন সেই আহ্বানে সাড়া দিতে। কোন প্রতিদ্বন্দ্বীই তাঁর কাছ থেকে রেহাই পায়নি পরাজয়ের লাঞ্ছনা থেকে। ভবঘুরে হেনরী হয়ে পড়েন অজেয় মুষ্টিযোদ্ধা। এক অবিস্মরণীয় ও অভূতপূর্ব প্রতিভার সাক্ষাৎ পায় জনসাধারণ। ঘূর্ণী বাতাসের সঙ্গে তুলনা করা হতে থাকে তাঁর আক্রমণের কৌশলকে। অবিরাম অবিশ্রান্ত আক্রমণধারা ছিল সেই কৌশলের মূলমন্ত্র। তাঁর সুঠাম দুই বাহুর অপরিসীম শক্তিযুক্ত মুষ্ট্যাঘাতের দুর্বার আক্রমণধারার বিরুদ্ধে কোন মুষ্টিককেই বেশিক্ষণ আত্মরক্ষা করতে দেখা যেতো না।

উপর্যুপরি ২৬টি লড়াইয়ে বিজয়ের পর ১৯৩৭ সালের ২৯শে অক্টোবর ফেদার ওয়েট বিভাগে বিশ্ববিজয়ীর জয়মাল্য লাভের আশায় হেনরী, পিটার স্যারন-এর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন। স্যারন মাত্র ৬ রাউণ্ড হেনরীর আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারপর লুটিয়ে পড়ে তার দেহ। ফেদার ওয়েট বিভাগে বিশ্ববিজয়ী হিসেবে হেনরী আর্মষ্ট্রং-এর নাম ঘোষণা করা হয়। ফেদার-ওয়েটের একচ্ছত্র সম্রাট হয়েও তাঁর মন ভরে না। আরও সম্মান—আরও প্রতিপত্তি—আরও কঠিনতম প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য হেনরী এগিয়ে আসেন। ওয়েল্টার ওয়েট বিভাগের খেতাবের জন্য মাত্র আট মাস ব্যবধানে

১৯৩৮ সালের ৩১শে মে তাঁকে অবতীর্ণ হতে দেখা যায় বার্নিরসের বিরুদ্ধে। ১৫ রাউণ্ড ভীষণতম লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর ঈপ্সিত ওয়েল্টার ওয়েট বিভাগে বিজয়ীর মুকুট লাভ করেন। দুটি বিভাগে বিশ্ববিজয়ী হিসাবে মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে সর্বপ্রথম তাঁর নাম লিখিত হয়।

দর্শকমাত্রেই হেনরীর নামে হয়ে ওঠে উন্মাদ। যেখানেই তাঁর লড়াই হোক না কেন, স্থানাভাবে অগণিত দর্শক সেই লড়াই দেখবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে ফিরে যায়। মুষ্টিযুদ্ধের উন্নত কলা-কৌশলের সাহায্যে হেনরীও উৎসাহ যোগাতে থাকেন দর্শকদের উন্মাদনায়। মাত্র আড়াই মাস পরে ১৯৩৮ সালের ১৭ই আগস্ট লো এম্বার্সের বিরুদ্ধে তিনি যখন অবতীর্ণ হন, লাইট ওয়েট বিভাগে বিশ্ববিজয়ী হবার আশায় তখন সারাবিশ্ব এক অকল্পনীয় ইতিহাস সৃষ্টির শুভলগ্নের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। ১৫ রাউণ্ড প্রাণপণ চেষ্টা করে এম্বার্স হেনরীর দুর্বার আক্রমণ-ধারার কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হন। হেনরীকে ঘোষণা করা হয় বিজয়ী বলে। ত্রিমুকুটের অধিকারী হেনরী আর্মষ্ট্রংকে বিশ্বের সকল দেশের সকল জাতির মুষ্টিকেরা শ্রদ্ধানত চিত্তে অভিনন্দন জানায়। ইতিহাসে ফেদার ওয়েট, ওয়েল্টার ওয়েট ও লাইট ওয়েট বিভাগে বিশ্ববিজয়ী হিসাবে সর্বপ্রথম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয় হেনরী আর্মষ্ট্রং-এর নাম। অর্থ সম্মান অযাচিতভাবে বর্ষিত হতে থাকে সেই শিশুকালের অতি দীন অনশন-ক্লিষ্ট অশিক্ষিত নিগ্রো যুবকের উপর।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসে হেনরীর মনে। একদিন যে ঈশ্বরের রাজ্যে এক মুষ্টি অন্নের আশায় তাঁকে ঘুরতে হয় দিনের পর দিন, অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সেই করুণাময়ের ইচ্ছায় আবার যখন তিনি অপরিমেয় ধন-দৌলত ও সম্মান লাভের অধিকারী হন, তখন মানুষ যে সেই সর্বনিয়ন্তার হাতের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়, একথা অন্তর দিয়ে তিনি অনুভব

করেন। কে যেন তাঁকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে নিরন্তর স্মরণ করিয়ে দেয়—এ বিশ্বে সবই মিথ্যা, সত্য শুধু ভগবান। তাই তিনি নশ্বর পৃথিবীর সকল কাজ দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে বেছে নেন—

"বিশ্বের যিনি অণু পরমাণু,
নিঃস্বের যিনি প্রাণ,
সত্যের যিনি জন্মদাত্রী,
ব্যথিতের যিনি ত্রাণ"......

সেই সর্বশক্তিমানের মহিমা কীর্তনের কাজ। ধর্মযাজকের বেশ তুলে নেন অঙ্গে। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কেটে যায় তাঁর পরম আনন্দের মাঝে ঈশ্বরের আরাধনায়।
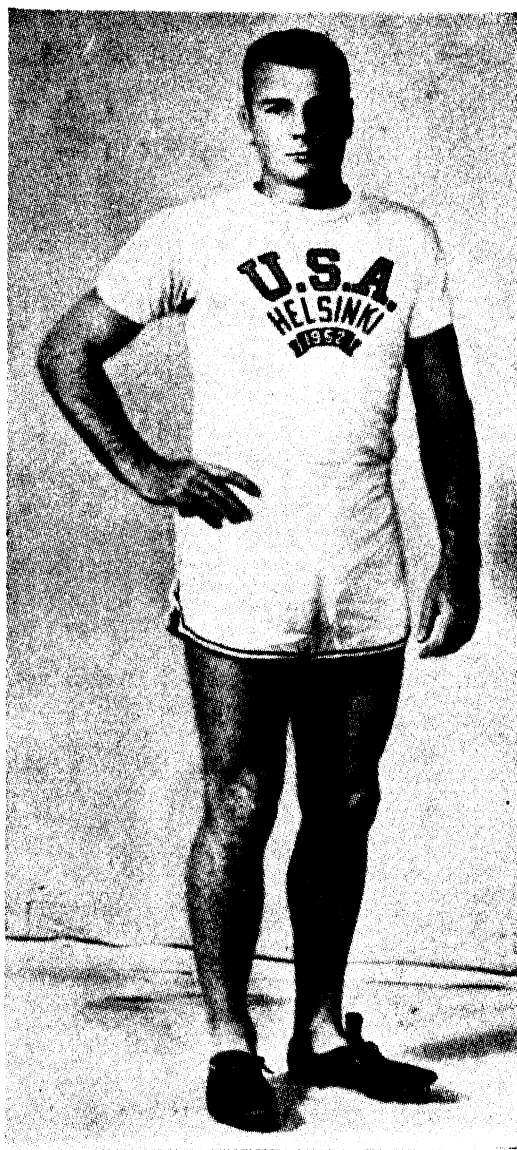
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চৌকস এ্যাথলেট বব্ ম্যাথিয়াস

## রবার্ট ব্রুস (বব্) ম্যাথিয়াস

বিশ্বের খেলাধুলার শ্রেষ্ঠ আসর অলিম্পিকে এমন একটি প্রতিযোগিতা আছে, ১৮ বছরের আগে যে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা এ্যাথলেটিক-বিশ্বের ধারণা-বহির্ভূত ঘটনা ছিল। কিন্তু কয়েক বছর অলিম্পিক বন্ধ থাকবার পর ১৯৪৮ সালে যুদ্ধক্লান্ত বিশ্বে আবার যখন অলিম্পিকের আসর বসলো, মরণ আলিঙ্গনের পর মানুষ মেতে উঠলো যখন বন্ধুত্বের আলিঙ্গনের জন্য—পারস্পারিক প্রীতির সম্পর্ক দৃঢ় করবার জন্য, তখন সবারই ভুল ভাঙলো। ১৭ বছর বয়সের নাবালক স্কুল-ছাত্র বব্ ম্যাথিয়াস 'ডেকাথলন' চ্যাম্পিয়ন হয়ে সকলকে স্তম্ভিত করে দিলেন। 'ডেকাথলন' অর্থাৎ দশটি বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। চৌকশ এ্যাথলেট হিসেবে 'ডেকাথলন' বিজয়ীর সম্মান অনন্য। 'ডেকাথলনে' বিভিন্ন দূরত্বের দৌড় আছে তিন রকমের—১০০ মিটার, ৪০০ মিটার ও ১,৫০০ মিটার। তিন রকমের আছে লাফ—দীর্ঘ লাফ, উঁচু লাফ আর দণ্ডের সাহায্যে লাফ। ছুঁড়তে হয় তিন রকমের জিনিস—লোহার চাকতি, লোহার ভারী বল, আর বর্শা। বাকী বিষয়টি হচ্ছে হার্ডল অর্থাৎ প্রতিবন্ধক দৌড়। প্রতিযোগিতার বিষয়গুলি দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, সর্ববিশারদ এ্যাথলেট ছাড়া 'ডেকাথলনে' প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অসম্ভব। আর এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হলে কতখানি শারীরিক পটুতা, কত নৈপুণ্য, কত অনুশীলন এবং কত সাধনার প্রয়োজন, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ১৭ বছরের স্কুলের ছেলে বব্ ম্যাথিয়াসের সাধনা করবার অবসর কোথায়? স্বাস্থ্যই ছিল তার প্রধান সম্পদ আর ছিল মানসিক দৃঢ়তা। ভগবদ্দত্ত নৈপুণ্য এবং সেই সর্বনিয়ন্তার আশীর্বাদও হয়ত অলক্ষ্যে তার উপর বর্ষিত হয়েছিল অলিম্পিক বিজয়ের প্রাক্কালে। বব্ ম্যাথিয়াসের মনে এ ধারণা অবশ্য ছিল না যে,

ডেকাথলন সমস্ত ট্রাক ও ফিল্ড প্রতিযোগিতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিনতম প্রতিযোগিতা। এই ডেকাথলনে জয়লাভ করতে হলে ট্রাকের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সহিষ্ণুতা ও গতিবেগের যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনি ফিল্ডের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে হলে প্রয়োজন শক্তি ও দক্ষতার। দীর্ঘদিনের কঠিনতম অভ্যাস ও বহুদিনের অভিজ্ঞতা ছাড়া যে এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া যায় না, এ প্রচলিত প্রবাদেও তিনি কান দেননি। মাত্র ৪৮ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এই ১০টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে বলেও তাঁর কোন চিত্তচাঞ্চল্য দেখা যায়নি। শুধু একটি ধারণা ঐ যুবকের মনে সেদিন বদ্ধমূল ছিল যে, ১৯৪৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিকের ডেকাথলন প্রতিযোগিতায় তাঁকে জয়লাভ করতেই হবে। ঐ দৃঢ় ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি তাঁর স্কুলের শিক্ষক ভার্জিল জ্যাকসনের অধীনে অনুশীলন সুরু করেন। ১৯৪৮ সালের ১০ই ও ১১ই জুন আমেরিকার অলিম্পিক প্রতিযোগীদের নির্বাচনের মাত্র ১৬ দিন আগে এবং অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ঠিক দু মাস পূর্বে তিনি প্যাসাডেনায় লস-এঞ্জেলস মেমোরিয়াল কলিসামে এমেচার এ্যাথলেটিক ইউনিয়ন পরিচালিত প্যাসিফিক কোস্ট গেমস-এর প্রতিযোগিতায় জীবনে প্রথম ডেকাথলনে অবতীর্ণ হন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ম্যাথিয়াস ঐ প্রতিযোগিতায় বহু অভিজ্ঞ প্রতিযোগীদের মধ্যে ৭,০৯৪ পয়েণ্ট লাভ করে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই প্রতিযোগিতার ঠিক ১৬ দিন পর আমেরিকার অলিম্পিক প্রতিযোগীদের নির্বাচনের জন্য নিউ জার্সির অন্তর্গত ব্লুমফিল্ডে জাতীয় এমেচার এ্যাথলেটিক ইউনিয়ান প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে অলিম্পিক দলে তিনি নিজের স্থান করে নিতে সমর্থ হন। ৫৬ দিন ব্যবধানে তাঁকে লণ্ডনে এসে উপস্থিত হতে হয় অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য।

লণ্ডন অলিম্পিকে এক নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি হয়। মাত্র ১৭

বছরের স্কুলের ছাত্র ম্যাথিয়াস ডেকাথলন প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করে সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগী হিসেবে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেন। লণ্ডন অলিম্পিকে বব্ হারিয়েছিলেন দেশ-বিদেশের ২৭ জন অভিজ্ঞ প্রতিযোগীকে আর তিনি অর্জন করেছিলেন ৭,১৩৯ পয়েণ্ট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ৭০০০ পয়েণ্টের বেশী সংগ্রহ করতে পারেননি। ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে তিনি আবার অবতীর্ণ হন ডেকাথলন প্রতিযোগিতায়। বিশ্বের সকল দেশের সকল প্রতিযোগীরাই এই অলিম্পিকেও তাঁর কাছে পরাজিত হন। ১০টি প্রতিযোগিতার মধ্যে ৯টিতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। অলিম্পিকের ইতিহাসে আর একটি নূতন অধ্যায় যুক্ত হয়। উপর্যুপরি ২টি অলিম্পিকের ডেকাথলনে সর্বপ্রথম বিজয়ী হিসাবে তাঁর নাম প্রথম লেখা হয়।

রবার্ট ক্রুস ম্যাথিয়াস ১৯৩০ সালের ১৭ই নবেম্বর ক্যালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত টুলারে জন্মগ্রহণ করেন। বব্ ম্যাথিয়াস তাঁর ডাক নাম। ম্যাথিয়াস যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁর মা আশা করেছিলেন যে এবারে তাঁর একটি কন্যাসন্তান হবে। কিন্তু প্রসবের পর যখন তিনি জানতে পারেন যে কন্যার পরিবর্তে তাঁর আর একটি পুত্রসন্তান হয়েছে তখন তিনি কেঁদে ফেলেন। তিনটি ভাই ও একটি বোনের মধ্যে বব্ হলেন দ্বিতীয়। তাঁর পিতার নাম চার্লি মিলফ্রেড ম্যাথিয়াস। মায়ের নাম লিলিয়ান হ্যারিস। ম্যাথিয়াসদের সংসারে খেলাধুলার উৎসাহ ছিল যথেষ্ট এবং তাঁর বাবা ও ভাইবোনদের বিভিন্ন খেলাধুলায় যথেষ্ট সুনাম ছিল। ম্যাথিয়াসের বাবার অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও অস্ত্রোপচারক হিসাবে যেমন খ্যাতি ছিল, তেমনি কলেজজীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। বড় ভাই চার্লস স্কুলের সেরা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন কিন্তু এক সাংঘাতিক দুর্ঘটনার জন্য ফুটবল খেলা চিরদিনের জন্য তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। ছোট ভাই

জেমস পলের এ্যাথলেটিকসের উপর ঝোঁক ছিল বেশী এবং তিনি আমেরিকার জাতীয় ডেকাথলন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার সুযোগ লাভ করেন। ছোট বোন প্যাট্রিকা লুইস সন্তরণে খুব পটু ছিলেন।

ম্যাথিয়াস শৈশবে অত্যন্ত রুগ্ন ও দুর্বল ছিলেন। দুর্বল ছেলে বলে দিবারাত্র যত্নের মধ্যে থাকলেও তিনি চিকেনপক্স, হাম, হুপিং কাশি ও সর্দি জ্বরে ভুগে এত বেশী দুর্বল হয়ে পড়েন যে বহুদিন পর্যন্ত বিশেষ পথ্য ও বিশেষ যত্নের মধ্যে তাঁকে রাখতে হয়। ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর দুর্বলতা এত বেশী ছিল যে দিনের বেলাতেও অনেক সময় তাঁকে ঘুমুতে দেখা যেতো। এর পর ডাক্তারেরা ম্যাথিয়াসকে অল্প পরিশ্রমযুক্ত খেলায় ধীরে ধীরে যোগদান করতে বলায় তাঁর দেহে এক বিস্ময়কর পরিবর্তনের সুরু হয়। যত বেশী সময় তিনি খেলার মাঝে কাটাতে থাকেন ততই দেখা যায় তাঁর দেহের উন্নতি হচ্ছে। ক্রমশ তাঁর প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুষ্ট ও বলশালী হয়ে ওঠে। ম্যাথিয়াস স্বাস্থ্যবান, বলশালী ও সুপুরুষ যুবকে পরিণত হন। এ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও ফুটবল ও বাস্কেটবল খেলায় ম্যাথিয়াস যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। স্কুল-জীবনে ট্রাক ও ফিল্ডের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তিনি মোট ৪০টি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ৪০টির মধ্যে ২১টিতে সৃষ্টি করেন তিনি নূতন রেকর্ড। ১৯৪৭ সালে ক্যালিফোর্ণিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতায় সটপাটে ও হাই হার্ডলসে তিনি বিজয়ী হন এবং হাই জাম্পে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। রিলে রেসের শেষ ল্যাপে তাঁর তীরগতি ক্ষিপ্রতায় টুলার স্কুল রিলে রেসে বিজয়ীর গৌরব লাভ করে।

এই প্রতিযোগিতায় ম্যাথিয়াসের অপূর্ব সাফল্য দেখে তাঁর স্কুলের শিক্ষক ভার্জিল জ্যাকসনের মনে ম্যাথিয়াসের অলিম্পিকে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা আছে বলে ধারণা জন্মে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে

জ্যাকসন ম্যাথিয়াসকে বিভিন্ন দৌড় ও হার্ডলিং-এর সঙ্গে বর্শা ছোঁড়া, পোল ভল্ট, গোলা ছোঁড়া প্রভৃতির কৌশল শেখাতে আরম্ভ করেই ক্ষান্ত হন না, আমেরিকার এ্যাথলেটিক ইউনিয়নের কাছে আমেরিকার অলিম্পিক দল নির্বাচনের জন্য যে প্রতিযোগিতা হবে সেই প্রতিযোগিতায় ম্যাথিয়াস যাতে যোগদান করতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও অনুমতি চেয়ে পাঠান। বর্শা ছোঁড়া ও পোল ভল্টে ম্যাথিয়াসের কোন অভিজ্ঞতাই এর আগে ছিল না। যাই হোক, মাত্র তিন সপ্তাহ এইভাবে অনুশীলন করবার পর তিনি প্যাসিফিক কোস্ট গেমস-এ জীবনে প্রথম ডেকাথলনে অবতীর্ণ হবার সুযোগ পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিন সপ্তাহের অনুশীলনেই তিনি এই প্রতিযোগিতায় ১৭১ ফুট দূরে বর্শা নিক্ষেপ করেন এবং পোল ভল্টে ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি অতিক্রম করতে সমর্থ হন। এই প্রতিযোগিতার ১৬ দিন পরেই ম্যাথিয়াস লণ্ডন অলিম্পিকে আমেরিকার জাতীয় দল নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় ডেকাথলনে প্রথম স্থান অধিকার করে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার জন্য আমেরিকার জাতীয় দলে স্থান লাভ করেন। তাঁর এই বিস্ময়কর সাফল্যে আমেরিকার জনসাধারণ বিস্মিত হইয়া যায়।

১৯৪৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিকে ডেকাথলন প্রতিযোগিতা সুরু হওয়া থেকেই দুর্যোগ আরম্ভ হয়। অবিশ্রান্ত বর্ষণের মাঝেই প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। প্রথম দিনের প্রতিযোগিতা শেষ হবার পর দেখা যায় যে, ম্যাথিয়াসের স্থান হয়েছে আর্জেন্টিনার কিস্টেনম্যাচার ও ফ্রান্সের হেনরিকের পর। দ্বিতীয় দিনেও বর্ষণের বিরাম নেই। দৌড়োবার ট্রাক জলসিক্ত। স্বাভাবিকভাবে দৌড়োনো সম্ভব নয়। ডিসকাস ছোঁড়া প্রতিযোগিতা চলবার সময়ে একজন বিচারক কোন একজন প্রতিযোগীর ডিসকাস অনুসরণ করতে গিয়ে ম্যাথিয়াসের সবচেয়ে দূরে ছোঁড়া ডিসকাসের নিশানা তুলে ফেলেন। ফলে এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। যাই হোক, অনেক চেষ্টায় সেই

নিশানার সন্ধান মেলে এবং ঐ দূরত্ব মেপে দেখা হয় ১৪৪ ফুট ৪ ইঞ্চি।

ম্যাথিয়াসের তখনও বর্শা ছোঁড়া, পোল ভল্ট ও ১,৫০০ মিটার দৌড় বাকী। এদিকে ফ্রান্সের হেনরিকের ডেকাথলনের ১০টি প্রতিযোগিতাই শেষ হয়ে গেছে এবং তিনি ৬,৯৭৪ পয়েণ্ট লাভ করেছেন। ম্যাথিয়াস এই সংবাদে বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ হন না। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছে। অলিম্পিক মশালের অনির্বাণ দীপশিখার আলো স্টেডিয়ামের উপরে এসে পড়েছে আর স্টেডিয়ামের ছোট ছোট আলো থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি দৌড়োবার ট্রাকে ফেলছে কালো ছায়া। এই অবস্থায় ম্যাথিয়াস পোল ভল্ট সুরু করেন। দৌড়োবার পথটি সম্পূর্ণ সিক্ত, এমন কি, যে পোলটি ধরে তিনি লাফিয়ে উঠবেন সেটাও পিচ্ছিল। অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। বিচারকেরা দৌড়োবার পথে ও লাফিয়ে পার হবার কাঠিটার উপর ফ্লাশ লাইট ফেলে প্রতিযোগীদের সাহায্য করছেন। অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে। সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেই বর্শা ছোঁড়া আরম্ভ হয়। রাত্রি যখন ১০টা বেজে ৩০ মিনিট, তখন তাঁর শেষ প্রতিযোগিতা ১৫০০ মিটার দৌড় আরম্ভ করবার নির্দেশ আসে। ম্যাথিয়াস সাড়ে বারো ঘণ্টা ধরে ট্রাকে রয়েছেন। বর্ষণে সিক্ত, শীতে অবসন্ন, ক্ষুধায় কাতর ম্যাথিয়াস এই সময় শুনলেন যে, ৫ মিনিট ৪৯ সেকেণ্ডে তিনি যদি ঐ ১,৫০০ মিটার দৌড়ের দূরত্ব অতিক্রম করতে পারেন তাহলে ডেকাথলনে তিনি বিজয়ী হতে পারেন। জয়লাভের উদগ্র কামনায় উদ্বুদ্ধ দীর্ঘকান্তি তরুণ এ্যাথলেট ভুলে যান দেহের ক্লান্তি ও অবসাদ। জয়ী তাঁর হতেই হবে, এই দৃঢ় মনোবল নিয়ে তিনি এগিয়ে যান—দৌড় সুরু করবার জন্যে। মাত্র ৫ মিনিট ১১ সেকেণ্ডে ম্যাথিয়াস ১,৫০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে ফ্রান্সের হেনরিক থেকে ১৬৫ পয়েণ্ট বেশী অর্থাৎ ৭,১৩৯ পয়েণ্ট লাভ করে বিজয়ী বলে

ঘোষিত হন। হেনরিক ৬,৯৭৪ পয়েণ্ট পেয়ে লাভ করেন দ্বিতীয় স্থান।

লণ্ডন অলিম্পিকে সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগী হিসাবে ডেকাথলনে বিজয়ী হবার পর ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায় আমেরিকার শ্রেষ্ঠ খেলাধুলার সম্মান "জেমস ই. সুলিভ্যান মেমোরিয়াল ট্রফি" তিনি লাভ করেন।

লণ্ডন অলিম্পিক থেকে ফেরবার পর ম্যাথিয়াস প্যানিসেলভিনিয়ার অন্তর্গত স্লাজবার্গের কিস্কি স্কুলে ভর্তি হন। কিস্কি হাইস্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এই স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায় পুনরায় তিনি ফুটবল খেলা অনুশীলন করে ব্যাকের খেলোয়াড় হিসাবে এমন সুনাম অর্জন করেন যে ১৯৫২ সালে তাঁকে স্টানফোর্ডের শ্রেষ্ঠ ফুটবল দল 'রোস বার্ডল দলের' সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

ফুটবল খেলায় মনোযোগ দিলেও ১৯৫২ সালের অলিম্পিকের ডেকাথলনের বিষয়ে সকল সময় তিনি সচেতন থাকেন। প্রয়োজনীয় অনুশীলন করতে কোনদিনই তিনি কার্পণ্য করেন না। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত উপর্যুপরি চার বছর আমেরিকার জাতীয় ডেকাথলন প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে এক নূতন কীর্তির অধিকারী হন তিনি। শুধু তাই নয়, এই চারবার বিজয়ীর সম্মান লাভের মধ্যে ১৯৫১ সালের তৃতীয়বারের প্রতিযোগিতায় তিনি ৮,০৪২ পয়েণ্ট লাভ করে ডেকাথলনে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে বব্ ম্যাথিয়াস ডেকাথলনের ১০টি প্রতিযোগিতার মধ্যে ৯টিতে প্রথম স্থান লাভ করেন এবং নিজের পূর্বতন অলিম্পিক রেকর্ড থেকে ৭৪৮ পয়েণ্ট বেশী অর্থাৎ ৭,৮৮৭ পয়েণ্ট অর্জন করে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার ডেকাথলনে বিজয়ী হন। অলিম্পিকে উপর্যুপরি দুইবার ডেকাথলনের বিজয়ী হিসাবে তাঁর নাম প্রথম লেখা হয়।

হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের পর ম্যাথিয়াসকে আমেরিকার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চৌকস এ্যাথলেট হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ববের দেহের ওজন ২০৪ পাউণ্ড। উচ্চতা ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। নীল চোখ। চুলের রং বাদামী। সুগঠিত দেহ, প্রিয়দর্শন যুবক তিনি। ১৯৫৫ সালের ২৭শে নবেম্বর ম্যাথিয়াস ২৫ বছরে পদার্পণ করেছেন। অমায়িক মধুর ব্যবহারে শুধু নিজের দেশে নয়, পৃথিবীর নানা দেশে অসংখ্য বন্ধু, অনুরাগী ও শুভাকাঙ্ক্ষী তিনি লাভ করেছেন। দেশে-বিদেশে ঘোরা, ছবি তোলা, পিয়ানো বাজানো তাঁর জীবনে অনেক আনন্দের খোরাক জুগিয়ে থাকে। ওয়াই. এম. সি. এ-র তিনি একজন উৎসাহী কর্মী। রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে তিনি রিপাব্লিকান দলের সমর্থক। যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর জীবন-কাহিনী অবলম্বনে 'দি বব্ ম্যাথিয়াস স্টোরী' নামে একটি ছায়াচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। সপত্নী বব্ এই চিত্রে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। বর্তমানে তিনি মার্কিণ নৌবাহিনীর একজন অফিসার।

১৯৫৫ সালের নবেম্বর মাসে বব্ ম্যাথিয়াস ভারতে শুভেচ্ছা সফরে আসায় ভারতীয় জনসাধারণ বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ চৌকস এ্যাথলেটকে চাক্ষুস দেখবার ও পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সফরের সময়ে তিনি এ্যাথলেটিকসে তাঁর বিরাট প্রতিভার যেমন পরিচয় দেন, তেমনি ভারতীয় এ্যাথলেটদের মান উন্নয়ন করার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা দিতেও কার্পণ্য করেন না। ম্যাথিয়াস আজ পেশাদার বৃত্তি গ্রহণ করলেও খেলাধুলার ইতিহাসে তাঁর নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।
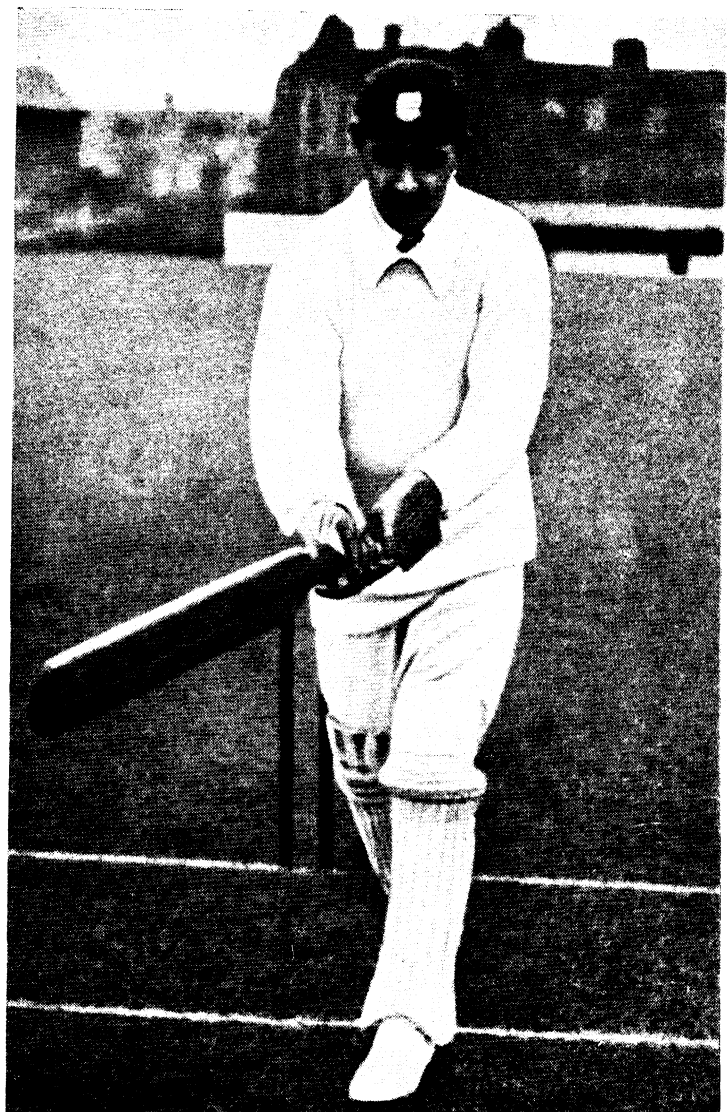
ক্রিকেটের অমর ও অদ্বিতীয় রণজি

# রণজিৎ সিংজী

কোন্ ভারতীয় খেলোয়াড় সর্বপ্রথম তাঁর নিজস্ব প্রতিভায় ইংলণ্ডের গণ্ডগ্রাম থেকে শহরের জনসাধারণের মন জয় করে নিয়েছিলেন? কার কথা ইংলণ্ডের সভা-সমিতিতে, ক্লাবে, নাচ-গানের উৎসবে এবং সংবাদপত্রের প্রধান স্তম্ভে আলোচিত হতো? আজও ইংলণ্ডের নিভৃত পল্লীতে অথবা শহর থেকে বহুদূরের দ্বীপ বা উপদ্বীপের লোকদের কাছে কোন্ ভারতীয়ের নাম রূপকথার কাহিনী হিসাবে প্রচারিত? এ প্রশ্ন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে যাঁর নাম অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই উচ্চারণ করবেন তিনি হলেন রণজিৎ সিংজী। বিশ্বের ধুরন্ধর এবং ভারতের অদ্বিতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় তিনি।

ভারতকে তিনিই প্রথম বিশ্বের খেলাধুলার আসরে স্থান করে দিয়েছেন। খেলাধুলায় ভারতের প্রতিভা তাঁকে কেন্দ্র করেই সমস্ত পৃথিবী স্বীকার করে নিয়েছে। তাঁর অপূর্ব খেলার চারুসুষমায় মুগ্ধ ও মুখর ইংলণ্ডের জনসাধারণ ভারতীয়দের সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করবার অবকাশ পেয়েছে। সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারভুক্ত ইংলণ্ডের ক্রিকেট পরিচালকেরা ভারতীয়দের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব ভুলে গিয়ে জাতীয় সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তাঁর সাহায্য বরণ করে নিয়েছে।

ক্রিকেট খেলার গতানুগতিক নিয়ম-কানুন বা ছকের বাঁধাধরা মারকে তুচ্ছ করে, সকলপ্রকার আক্রমণধারাকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে স্বকীয় ভঙ্গিতে তিনি যেরূপ দ্রুত রাণ তুলতে পারতেন, তা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাই ক্রিকেটরসিক ইংলণ্ডের জনসাধারণ তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'রাণগেট-সিংজী'। নিজস্ব ভঙ্গিমায় বল মারবার অপূর্ব কৌশল, এক উইকেট থেকে অন্য উইকেটে দৌড়োবার ক্ষিপ্রতা এবং ঝড়ের গতিতে রাণ তোলবার সাহস ও

দক্ষতা তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের মধ্যে স্থান করে দিয়েছে। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ৭২ বার শত রাণ করবার গৌরব তাঁর বিরাট প্রতিভার অন্যতম স্বাক্ষ্য হিসাবে বিরাজ করছে।

ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলার নবযুগের প্রবর্তক ডব্লিউ. জি. গ্রেস রণজিৎ সিংজীর ক্রিকেট খেলা থেকে বিদায় গ্রহণের সময় বলেছিলেন—

"I assure you that you will never see a batsman to beat Jam Saheb if you live for a hundred years."

ইংলণ্ডের বিখ্যাত পত্রিকা 'ডেলি নিউজে' লেখা হয়েছিলো।

"The king of cricket will come no more·········The well-graced actor leaves the stage and becomes only a memory···Prince of a little state but king of a great game......he is not a miser hoarding up runs, but a milionaire spending with a liberal yet judicious prodigality.......His batting can be compared with Asquith's oratory." লর্ড সেলসবেরী বলেছিলেন—"Here was a black man playing cricket for all the world to see as if he were a white man". এমনকি তিনি যে সিল্কের সার্ট পরে খেলতেন সেই সার্ট সম্বন্ধে ই. ভি. লুকাস কবিত্ব করে বলেছিলেন—"It rippled in the breeze and seemed to carry into infinity the smooth follow-through."

১৮৭৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর রণজিৎ সিংজী জন্মগ্রহণ করেন। নবনগরের জামসাহেব জাম বিভাজীর তিনি দত্তক পুত্র ছিলেন। সিংহাসনের অধিকার থেকে বিচ্যুত করবার জন্যে এবং এই পথে নিরুদ্বিগ্ন ভাবে অগ্রসর হবার জন্যে তাঁকে পড়াশুনার অছিলায় ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইংলণ্ডে আসবার আগে তিনি রাজকোটের রাজকুমার কলেজে ৯ বছর পড়াশুনা করেন। রাজকুমার

কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন কেম্ব্রিজ ব্লু চেস্টার ম্যাকনাটেন। ক্রিকেট খেলায় ম্যাকনাটেন যেমন ছিলেন অভিজ্ঞ, তেমন ছিলেন উৎসাহী। ম্যাকনাটেনের কাছেই রণজিৎ সিংজীর ক্রিকেট খেলার প্রথম হাতেখড়ি। রণজিৎ সিংজীর প্রতিভা দেখে ম্যাকনাটেন মুগ্ধ হয়ে যান। রাজকোট থেকে রণজী ইংলণ্ডে যখন পড়তে আসেন, তখন ঘটনাচক্রে ম্যাকনাটেনও লণ্ডনে ফিরে এসেছেন। ক্রিকেট খেলায় বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করে রণজীর প্রতিভা ক্রমশই যাতে মূর্ত হয়ে উঠতে পারে এই আশায় ম্যাকনাটেন রণজীকে বড় বড় খেলা দেখতে নিয়ে যেতেন এবং খেলার মাঠেই ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের সঙ্গে রণজীর পরিচয় করিয়ে দিতেন।

১৮৮৯ সালে রণজী কেম্ব্রিজে আসেন। 'ট্রিনিটি' কলেজের রেভারেণ্ড বরিশ'-এর তত্ত্বাবধানে ও তাঁর সংসারে বাস করেই রণজীর কেম্ব্রিজের লেখাপড়ার পাঠ সুরু হয়। রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও রাজকুমার হিসাবে তিনি যে-সব সুযোগ-সুবিধা পেতেন সেরূপ খুব কম ছেলের ভাগ্যেই তখন জুটতো। সেই কারণেই ট্রম্পিংটন রোডে 'সেণ্ট ফেথ স্কুলে' সহজেই খেলাধুলার অভ্যাস করবার সুযোগ তাঁর মিলে যায়। সেণ্ট ফেথ স্কুলের প্রধান শিক্ষক আর. এস. গুডচাইল্ড ক্রিকেট খেলার পরম উৎসাহী ছিলেন। রণজীর খেলায় অপূর্ব নৈপুণ্য দেখে তিনি এমন মুগ্ধ হন যে, বহু বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে ডানহাওয়ার্ড, সার্প, রিচার্ডসন, লকউড ও ওয়াটের মত বিখ্যাত পেশাদারী বোলারদের সঙ্গে তিনি রণজীর ক্রিকেট অনুশীলনের ব্যবস্থা করে দেন।

রণজীর প্রতিভা কেম্ব্রিজের 'পার্কার পিচেই' প্রথম বিকশিত হবার সুযোগ পায়। ক্রিকেটের ছক-বাঁধা মারের নিয়ম-কানুনকে তুচ্ছ করে তিনি তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিতে বেপরোয়াভাবে রাণ তুলে ইংলণ্ডের ক্রিকেট সমাজের আলোচনার পাত্র হয়ে ওঠেন। কেম্ব্রিজের ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন। জ্যাকসন

একদিন 'পার্কার পিচের' চারধারে ভীষণ ভিড় দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন। দেখলেন এক যুবক হাঁটু গেড়ে বসে একটি তীব্র বলকে লেগের দিকে মেরে বাউণ্ডারীতে পাঠাচ্ছেন। জ্যাকসন আরও দেখলেন, অনায়াস এবং সাবলীল ভঙ্গিতে সেই যুবক রাণের পর রাণ তুলে যাচ্ছেন। প্রত্যেকটি মার তাঁর নিজস্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। নিয়ম-কানুন মত ব্যাট চালনার কোন বালাই নেই। জ্যাকসন ছিলেন ক্রিকেট খেলার বিজ্ঞানসম্মত এবং নিয়মমাফিক মারের গোঁড়া সমর্থক, তাই রণজীর এই খেলা সেদিন তিনি সুনজরে দেখতে পারেন নি। কিন্তু জ্যাকসন ভালো না বললে কি আসে যায়। অগণিত দর্শক করতালি ধ্বনিতে মুখরিত করে তুলছে মাঠের আকাশ-বাতাস। রণজীর ক্ষিপ্র রাণ তোলার চাতুর্যে সেই দর্শকেরা তখন উন্মাদ। তিনি যে ক্রিকেট খেলার গতানুগতিক নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করে খেলতেন সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই পরবর্তী জীবনে তিনি বলেছেন—

"I found a great difference between the English style and my own."

এই সময়ে রণজীর প্রতিভা ক্রমশই উচ্চ থেকে উচ্চ স্তরে উঠতে থাকে। এত দ্রুত এই সময়ে তিনি রাণ তুলতেন যে একই দিনে দুটি বিভিন্ন দলের হয়ে খেলার সময়ে তিনি তিনটি সেঞ্চুরী করেছিলেন বলেও শোনা যায়।

ক্রিকেট খেলায় রণজীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 'লেগ গ্লান্স' মার অন্যতম। এই বিশেষ মারের সাহায্যে তিনি যে কোন আক্রমণধারাকে উপেক্ষা করে অসংখ্য রাণ তুলতে পারতেন। তিনি যখন লেগ গ্লান্স করতেন, তখন তাঁর ডান পা বিন্দুমাত্র নড়তো না। দেহটিকে সম্পূর্ণ বেঁকিয়ে এবং কব্জির অপূর্ব দক্ষতায় তিনি লেগ গ্লান্স করতেন। এই লেগ গ্লান্স মারে তাঁর এত জোর ছিল যে বিপক্ষ খেলোয়াড়েরা অনেক সময় সেই বল দেখবার সুযোগ পেতো না এবং কখনো কখনো

বল দেখতে পেলেও সেই তীব্র ও মারাত্মক বেগে ধাবিত বলের গতিরোধ করতে সাহসী হতো না। ইংলণ্ডের বিখ্যাত পত্রিকা 'ডেলি টেলিগ্রাফ' রণজীর এই মারের তীব্রতা সম্বন্ধে বলেছেন—

"........it goes to leg and boundary like a shell from a 7-pounder, immense, audacious, unstoppable." মিস্টার রোলাণ্ড ওয়াইল্ড রণজীর জীবনী লিখতে গিয়ে তাঁর এ বিশেষ মার সম্বন্ধে বলেছেন—"Thus was born the greatest scoring stroke ever known. For Ranjit Singhji, with his right foot perforce immovable, still refused to play on the defensive. To the amazement of the bowlers he twisted his body, flicked his wrists, and smashed the ball round the leg. They sent him good length balls and he treated them in the same manner. They declared that it was risky, unconventional and in fact 'not cricket.' His reply was to score *fours* off them".

এই মন্তব্যের পর তাঁর মারের তীব্রতা সম্পর্কে মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

'আক্রমণই শ্রেষ্ঠ রক্ষণ'—এই ছিল তাঁর খেলার মূল নীতি। বল জোরেই আসুক আর আস্তেই আসুক, কিংবা সোজাই আসুক অথবা বেঁকেই আসুক, তুমি যেভাবে খুশি বল করো না কেন—আমি ঠিক মেরে যাবো, এই ছিল রণজীর খেলা। এই মনোবল তৈরী করতে হলে কতখানি দক্ষতা ও নিপুণতা অর্জন করা প্রয়োজন তা আশা করি ক্রিকেট খেলার উৎসাহী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝতে পারেন।

খেলাধুলা নিয়ে রণজী দিবারাত্র এত মেতে থাকতেন যে রেভারেণ্ড বরিশ' রণজীর লেখাপড়ার বিষয়ে সকল আশা ছেড়ে দেন। কিন্তু

১৮৯২ সালে রণজী সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। এতদিন তিনি বরিশ'র সংসারেই বাস করতেন। কলেজে ভর্তি হয়ে রণজী নিজে বাসা করেন সিডনি স্ট্রীটে। নিজের মনের মত করে অজস্র অর্থব্যয়ে তিনি তাঁর' এই বাসাটি সাজান। পরবর্তীকালে এই বাসাতেই ক্রিকেট খেলার বহু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা হয়েছে—বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের আনন্দমুখরিত কত দিন এই বাড়িতে কেটে গেছে।

ক্রিকেট খেলায় রণজীর সুনাম এই সময় যথেষ্ট থাকলেও কেম্ব্রিজ দলে স্থানলাভ করা তাঁর পক্ষে সহজ হয় না। ক্রিকেট খেলা ইংরেজের খেলা ও খ্রীস্টানদের খেলা এবং যেহেতু রণজী ইংরেজও নন—খ্রীস্টানও নন, সেই হেতু তিনি কেম্ব্রিজ দলে স্থান পেতে পারেন না—এই ছিল কেম্ব্রিজ কর্তৃপক্ষের ধারণা। যাই হোক, এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৯২ সালের শেষাশেষি লর্ড হকের অধিনায়কত্বে একটি ক্রিকেট দল ভারত সফরে আসে। কেম্ব্রিজ দলের অধিনায়ক স্ট্যানলী জ্যাকসনও এই দলের অন্যতম খেলোয়াড় হিসাবে ভারতে আসেন। ভারত থেকে ফিরে গিয়ে ইংরেজ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ধারণা হয় যে ভারতীয়রাও মানুষ এবং ক্রিকেট খেলায় তাঁদেরও হাত আছে। জ্যাকসনের এই মনোভাব পরিবর্তনের ফলেই রণজীর কেম্ব্রিজ দলে স্থান লাভ করা সম্ভব হয়। কেম্ব্রিজ দলে যোগদান করেই তিনি অল্পদিনের মধ্যেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৯৩ সালে রণজীকে 'ইউনিভার্সিটি ব্লু' দেওয়া হয়।

১৮৯৬ সাল রণজীর জীবনে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই বছর প্রথম ভারতীয় হিসাবে তিনি ইংলণ্ডের টেস্ট দলে স্থান লাভ করেন। এম. সি. সি-র সভাপতি লর্ড হ্যারিস নির্বাচনের বিপক্ষে থাকা সত্ত্বেও রণজীর প্রতিভায় মুগ্ধ অন্যান্য সকল সদস্যের ঐকান্তিক অনুরোধে ও দেশের সম্মান রক্ষার তাগিদে রণজীকে অস্ট্রেলিয়ার

বিরুদ্ধে টেস্ট দলে নির্বাচন করা হয়। প্রথম টেস্টেই রণজী ৬২ ও ১৫৪ (নট আউট) রাণ করে শুধু নিজের টেস্ট খেলার দাবি প্রতিষ্ঠিত করেন না, তাঁর দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত ১৫৪ রাণই নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে ইংলণ্ডকে রক্ষা করে। এই বছরের শেষে ২,৭৮০ রাণ করে তিনি ইংলণ্ডের ব্যাটিং 'এভারেজে' প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর এই রাণ সংখ্যার রেকর্ড ডব্লিউ. জি. গ্রেসের প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড ভঙ্গ করে নতুন রেকর্ড হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। রণজীর এই সাফল্যকে অভিনন্দিত করার জন্যে কেম্ব্রিজে এক বিরাট সভা আহ্বান করা হয়। ইংলণ্ডের সকল শ্রেণীর জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রণজীকে অভিনন্দিত করেন।

১৮৯৬ সাল ছাড়াও ১৯০০ এবং ১৯০৪ সালেও তিনি ইংলণ্ডের ব্যাটিং এভারেজে শীর্ষস্থান লাভ করেন। ১৮৯৫ সালে সাসেক্স দলে যোগ দিয়েই নিজেকে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে প্রমাণিত করেন। ১৮৯৭-৯৮ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ইংলণ্ড দলে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করা হয়। এই সফরে সিডনিতে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে তিনি ১৭০ রাণ করেন এবং অসুস্থ অবস্থায় এডিলেড মাঠে ১৮৯ রাণ করে সকলকে হতবাক্ করে দেন। অস্টেলিয়া সফরে মোট ১০৭২ রাণ লাভ করায় তাঁর এই রাণ সংখ্যার রেকর্ড ইংলণ্ডের সকল ব্যাটসম্যানদের গৌরবকে ম্লান করে দিয়ে নবতম রেকর্ড হিসাবে গৃহীত হয়। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলাগুলিতে তাঁর মোট রাণ সংখ্যা হয় ৯৮৫ এবং এই ব্যাটিং-এর গড়পড়তা ছিল ৪৪'৭৭। ইংলণ্ডের হয়ে মোট ১৪টি টেস্ট খেলায় তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ইংলণ্ডের ব্যাটিং এভারেজে তিনবার প্রথম স্থান, তিনবার দ্বিতীয় স্থান এবং একবার তৃতীয় স্থান লাভ করে অমর কীর্তি স্থাপন করেন তিনি। ১৮৯৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ডব্লিউ জি. গ্রেসের সর্বশেষ অধিনায়কতায় 'ট্রেন্টব্রিজ' মাঠে ইংলণ্ড দল রণজীর জন্যই নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। এই বছরে তাঁর রাণসংখ্যা

ছিল ৩,০০০। 'ফিলাডেলফিয়া এসোসিয়েটেড ক্লাবের' আমন্ত্রণে রণজীর অধিনায়কত্বে 'এমেচার টু দি নিউ ওয়ার্ল্ড' নামে একটি শক্তিশালী ক্রিকেট দল এই বছর ফিলাডেলফিয়া সফর করে।

রণজীর জীবনে সর্বশেষ গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি হয় ১৯০৮ সালে। ওভ্যাল মাঠে সাসেক্স দলের হয়ে সারের বিরুদ্ধে খেলবার সময়ে তিনি ডবল সেঞ্চুরী করবার কৃতিত্ব অর্জন করেন। সাসেক্স দলের হয়ে বার বছর খেলার মধ্যে কাউন্টি ক্রিকেটের ব্যাটিং এভারেজে রণজী ৯ বার প্রথম স্থান এবং ২ বার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯০১ সালে টনটন মাঠে সাসেক্স দলের হয়ে সমারসেট দলের বিরুদ্ধে ২৮৫ রাণে অপরাজিত থাকা রণজীর খেলার জীবনে সর্বোচ্চ রাণসংখ্যা। ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি নিয়মিত প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় অংশ গ্রহণ করেন এবং সাসেক্স দলের অধিনায়কত্ব করবার দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পিত হয়। অবশ্য, ১৯১৫ সালে ফিলের অন্তর্গত এসক্লিফ হাউসে এক বন্দুক ছোঁড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার সময়ে এক দুর্ঘটনায় রণজীর চোখে ভীষণ আঘাত লাগে যার ফলে তাঁর ঐ চোখটির দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। সেই কারণে ১৯১৫ সালের পর থেকেই তিনি তাঁর পূর্বের প্রতিভা হারিয়ে ফেলেন। এর পর ক্রিকেট খেলার বিভিন্ন প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন এবং ১৮৯৭ সালে তাঁর বিখ্যাত ক্রিকেট বই 'জুবিলী বুক অফ ক্রিকেট' প্রকাশিত হয়। রণজী তাঁর জীবনে প্রায় ২৫,০০০ রাণ সংগ্রহ করেছেন। এই রাণ সংখ্যার গড়পড়তা ছিল প্রতি ইনিংসে ৫৬। তিনি এক মাসের মধ্যে তিনবার ১,০০০ রাণ সংগ্রহ করেন।

লেগ গ্লান্স ছাড়া রণজীর আর একটি বিখ্যাত ও বিশেষ মার ছিল যা আজ পর্যন্ত অন্য কোন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মধ্যে দেখা যায় নি। রণজীর ক্রিকেট জীবনী রচয়িতা জ্যাকসন এই বিশেষ মার-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন,—"বোলার বল করছেন—বলটি

সোজাসুজি অথবা একটু অফে তীব্রভাবে উইকেটের দিকে ছুটে আসছে, এ জাতীয় বলে রণজী উইকেটে অবিচল থেকে শুধু মাত্র হাতের কব্জির অপূর্ব দক্ষতায় নিমেষে ব্যাটটাকে এমনভাবে চালনা করতেন যে অগণিত দর্শকেরা তাকিয়ে শুধু দেখতে পেতেন যে বলটি অন সাইডের বাউণ্ডারীর দিকে তীব্রভাবে ছুটে যাচ্ছে। বিস্ময়ে হতবাক্ বোলারের মুখ থেকে বার হয়ে আসতো—রণজীর পক্ষেই এ মার একমাত্র সম্ভব। খেলোয়াড়েরা শ্রদ্ধায় মাথা নত করতেন।”

শুধু মাত্র রাণসংখ্যা দিয়ে বিচার করতে গেলে রণজীর প্রতিভাকে নিঃসন্দেহে ছোট করা হয়। কুশলী শিল্পীর কণ্ঠে সঙ্গীত যেমন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তালে লয়ে, সুরের অপূর্ব মূর্ছনায় সেই সঙ্গীত যেমন শ্রোতাদের বাহ্যজ্ঞানশূন্য করে অনাবিল আনন্দের খোরাক যোগায়, তেমনি রণজীর খেলার মাঝেও দর্শকেরা পেতেন অনাবিল আনন্দের তীব্র প্রবাহ। রণজীর প্রত্যেকটি মার এত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং এত সহজ ও সাবলীল ছিল যে তাঁর ব্যাট চালনার ভঙ্গিমা দেখবার জন্য দর্শকদের রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেই খেলা উপভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকতো না। বিখ্যাত ক্রিকেট সমালোচক সি. বি. ফ্রাই ক্রিকেট জগতের ‘বিগ ফোর’-এর নাম উল্লেখ করতে গিয়ে যে চারজনের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁরা হলেন ডব্লিউ জি. গ্রেস, ভি. টি. ট্রাম্পার, রণজিৎ সিংজী ও ডন ব্রাডম্যান। ১৯৩৩ সালের ২রা জুন ক্রিকেট খেলার এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ইহলোক ত্যাগ করেন।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ক্রিকেট খেলা হয়ত পৃথিবীতে প্রচলিত থাকবে। আগামী দিনে আরও প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের হয়ত আবির্ভাব হবে। কিন্তু রণজীর প্রতিভা—রণজীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল ইতিহাস কালের সকল বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে গৌরবে মাথা উঁচু করে থাকবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

## রণজীর ক্রিকেট খেলার গৌরবোজ্জল জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

| | ইনিংস | নট আউট | রাণ | সেঞ্চুরী | এভারেজ |
|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট খেলায় | ২৬ | ৪ | ৯৮৫ | ২ | ৪৪'৭৭ |
| জেণ্টলম্যান-প্লেয়ার্সের খেলায় | ২৫ | ১ | ৬৬৮ | ১ | ২৭'৮৩ |
| কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির খেলায় | ১৫ | ২ | ৩৮৬ | — | ২৯'৬৯ |
| কাউন্টি খেলায় | ২৯৭ | ৩৬ | ১৬,১৯৪ | ৫১ | ৬২'০৩ |
| অন্যান্য খেলায় | ১৩৭ | ১৯ | ৬,৪৫৯ | ১৮ | ৫৪'৭৩ |
| মোট | ৫০০ | ৬২ | ২৪,৬৯২ | ৭২ | ৫৬'৩৭ |

টেনিস সম্রাজ্ঞী সুজানে ল্যাঙ্গলেন

## সুজানে ল্যাঙ্গলেন

বিশ্বের খেলাধুলার আসরে আজ মহিলাদের স্থান নগণ্য নয়। খেলাধুলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের আশাতীত সাফল্য সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছে। নব নব ইতিহাস সৃষ্টির উন্মাদনায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা যে ভাবে বেড়ে চলেছে তাতে আশা করা যায়, এই যাত্রার গতি অদূর ভবিষ্যতে রুদ্ধ হবে না—প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর পথে ক্রমেই বিস্তারলাভ করবে দেশে দেশে। কিন্তু সেই যাত্রাপথের পিছন দিকে চাহিলেও স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে—কয়েকজন মহিলার অপরূপ ক্রীড়াচাতুর্য যার রূপ-লাবণ্য আজও দর্শকদের বিস্মিত করে তোলে। সেই সব স্মরণীয় মহিলাদের কীর্তিগাথা আলোচনা করে মানুষ আনন্দ পায়—গৌরব অনুভব করে—অনুপ্রাণিত হয়।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান খেলা হিসাবে টেনিস খেলা কৌলীন্য লাভ করেছে অন্য অনেক খেলার বহু আগেই। সেই টেনিস খেলায় যে ফরাসী মহিলা চিরবিস্ময়ের মায়াজাল বিস্তার করে গেছেন তিনি হলেন সুজানে ল্যাঙ্গলেন। বিশ্বের প্রতিটি শ্রেষ্ঠ টেনিস মাঠের শ্যামল কোমল দূর্বাদলের সঙ্গে মিশে আছে তাঁর প্রাণরসে ভরপুর, লীলাচঞ্চল, অপরূপ নৃত্যের ছন্দ। রূপকথার রাজকুমারী তিনি। টেনিস সম্রাজ্ঞী নামেও তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় অগণিত লোকের মুখে। টেনিস খেলা যতদিন পৃথিবীতে প্রচলিত থাকবে টেনিস সম্রাজ্ঞী সুজানে ল্যাঙ্গলেনও ততদিন টেনিস রসিকদের স্মৃতিপটে চিরউজ্জ্বল—চিরজাগরূক থাকবেন।

১৮৮৯ সালের ২৪শে মে দক্ষিণ ফ্রান্সের 'ক্যাম্পিগ্ন' নামক স্থানে সুজানের জন্ম হয়। পিতামাতার বড় আদরের মেয়ে তিনি। তাই বড় আশা যে, তাঁদের তুলালী হবে বিশ্বের তুলালী—মুখে মুখে ছড়িয়ে থাকবে এই কন্যার নাম—বিশ্বের অন্যতম বিস্ময় হিসাবে বিবেচিত হবে সে। ছেলেবেলা থেকেই সুজানের মধ্যে টেনিস প্রতিভা

দেখা যায়। সেই প্রতিভা যাতে সযত্নে লালিত পালিত হয়, সেদিকে সকল সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখেন পিতামাতা। দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত-ভাবে সুজানের অনুশীলন সুরু হয়। একদিকে একজন ইটালীয়ান পেশাদারী শিক্ষক, অন্যদিকে সুজানে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিরামহীন চলে খেলা। নিজেদের বাড়িতেই খেলবার কোর্ট, সাধারণের সেখানে প্রবেশের অধিকার নেই। তাই একান্ত নিরালায় একমাত্র বাপমায়ের সতর্ক দৃষ্টির প্রহরায় সেই অনুশীলন-পর্ব চলতে থাকে। সামান্য ভুল ক্রটি হলে রক্ষে নেই, মায়ের তীব্র ভৎ´সনা তীব্রতর হয়ে দেখা দেয়। এক এক সময় সেই ভৎ´সনা এত ভীষণতম হয় যে, সুজানের চোখের জল অবিরতধারায় গড়িয়ে পড়ে দুই গণ্ড বেয়ে। কিন্তু রেহাই নেই—খেলা থেকে বিরাম নেবার কোন সুযোগ নেই। চোখের জল চোখেই শুকিয়ে যায়, তবুও চালিয়ে যেতে হয় খেলা। এইভাবে দুঃখ, মান, অভিমানকে তাঁর বিসর্জন দিতে হয়। মাঠের মাঝে পিতা ছোট ছোট কাগজ ছড়িয়ে দেন—চুন দিয়ে এঁকে দেন ছোট ছোট চৌকা ঘর, তারপর সুজানের পরীক্ষা সুরু হয়। পিতার আদেশ—বলা হয়, "ঐ কাগজের ওপরে বল ফেলো—ছোট ছোট ঘরের মধ্যে বল ফেলো।" কোন বন্ধু বা বান্ধবীর সঙ্গে মেশবার সুযোগও তাঁর হয় না। এইভাবে কঠোর সাধনায় দুশ্চর তপস্যার মাঝে কাটাতে হয় তাঁকে দীর্ঘকাল।

কিন্তু সেই সাধনা ব্যর্থ হয় না। মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিশ্ব হার্ডকোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর জয়মাল্য গলে পরে সুজানে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষদিক থেকেই সুজানের নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে নিজের দেশের মাঝে। ১৯১৮ সালে তাঁর কাছে পরাজয়ের লাঞ্ছনা থেকে ফ্রান্সের কোন মহিলা খেলোয়াড়ই রেহাই পায় না। কিন্তু সুজানের পিতার মন এইটুকু সাফল্যেই তৃপ্তি লাভ করে না। তিনি জানতেন তাঁর কন্যার প্রতিভার কথা। দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁর, শুধু ফ্রান্স কেন—সারা বিশ্বে এমন কোন মহিলা খেলোয়াড় নেই যে তাঁর কন্যার অনুপম খেলার কাছে

নতি স্বীকার না করবে। তাঁর সেই ধারণা যে বাতুলের প্রলাপ বা স্নেহান্ধ পিতার অতিশয়োক্তি নয় সে কথা বিশ্বের দরবারে প্রমাণ করার জন্যে কন্যাকে নিয়ে ১৯১৯ সালে যাত্রা করেন তিনি ইংলণ্ডের পথে—বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা উইম্বিলডনে।

আজানুলম্বিত স্কার্ট, ছোট হাতের জামা, আর একটা স্কার্ফ কপালে জড়িয়ে যেদিন সুজানে প্রথম র‍্যাকেট হাতে উইম্বিলডনের কোর্টে নামেন সেদিন উপস্থিত দর্শকেরা সুজানের ঐ পোশাককে বরদাস্ত করতে পারে না—বিরূপ সমালোচনা করতেও তারা দ্বিধা করেন না। কিন্তু সুজানে এসেছিলেন টেনিস খেলায় নব বিপ্লবের বাণী বহন করে। শুধু খেলার মাঝেই সেই বাণী মূর্ত হয়ে ওঠেনি—পোশাকে-আশাকে, ভাবে-ভঙ্গিমায়—এমন কি, দেহে মনেও সেই বাণী নব চেতনার দোলা দিতে সক্ষম হয়। তাই সেই সব বিরূপ সমালোচকরাই সুজানের খেলা সুরু হতে ভুলে যান তার পোশাকের কথা- প্রচলিত পা পর্যন্ত লম্বা স্কার্ট ও লম্বা হাতের জামার কথা। বিরাগ থেকে আসে অনুরাগ। তাই তাঁর সাফল্যের জন্য আসে শঙ্কা—আসে ভয়। সকলের মুখে শুধু একটি কথাই প্রতিধ্বনিত হতে থাকে 'কি অপূর্ব—কি সুন্দর এই ফরাসী মেয়েটির খেলা'। কিন্তু এই ছোট মেয়েটি কি পারবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ খেলোয়াড় মিসেস চেম্বার্সকে পরাজিত করতে? উপর্যুপরি তিন বছর বিশ্বের সকল মহিলা খেলোয়াড়দের পরাজিত করে যাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁকে কি পারবে এই তারুণ্যে উজ্জ্বল অনভিজ্ঞা বালিকা পরাজিত করতে? অন্তরে কিন্তু সকলের আকুল প্রার্থনা—'হে ঈশ্বর, তুমি এই বালিকাকে বিজয়ীর মুকুট পরিয়ে দাও।'

বহু প্রতীক্ষিত উইম্বিলডন-ফাইন্যালের শুভলগ্ন উপস্থিত। মেয়ে এসে দাঁড়ান পিতার কাছে। কন্যাকে বুকে টেনে নিয়ে মস্তকে চুম্বন করে আশীর্বাদ করেন সুজানের পিতা—"তুমি আজ বিজয়ী হবে।" সেই অভয়বাণী সুজানের দেহে মনে আনে নতুন শক্তি—নব প্রেরণা।

পিতার আশীর্বাদ সুজানের মনে এত দৃঢ় বিশ্বাস এনে দেয় যে খেলার মাঝে এমন এক সময় উপস্থিত হয় যখন তাঁর সামান্য একটিমাত্র ভুলের জন্যই মিসেস চেম্বার্স বিজয়িনী হতে পারেন। কিন্তু সেই অবস্থা থেকেই ধীরে ধীরে জয়লাভের পথে সুজানে এগিয়ে আসেন। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সুজানে অবসাদে যখন হাত ও পায়ের জোর হারিয়ে ফেলেন তখন তাঁর পিতা দূর থেকে ব্রাণ্ডিতে ভেজানো ছোট ছোট চিনির টুকরো ছুঁড়ে দেন। সেই চিনির টুকরো গালে ফেলে দিয়ে নব বলে বলীয়ান হয়ে আবার সুজানে খেলা চালিয়ে যান। অবশেষে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত জয়লাভ করায়ত্ত হয়। প্রথম আবির্ভাবেই সুজানে হন উইম্বিলডন বিজয়িনী। অগণিত দর্শক সকল বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে ছুটে আসে সুজানের কাছে অভিনন্দন জানাতে। ফুলে ফুলে ভরে ওঠে তাঁর দুই হাত। সকল দেশের সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে ছাপা হয় ফরাসী বালিকার টেনিস খেলার কীর্তিগাথা।

১৯১৯ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত উপর্যুপরি পাঁচ বছর উইম্বিলডনের সিঙ্গলস এবং ডাবলস-এ পৃথিবীর সকল দেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা খেলোয়াড়দের পরাজিত করে সুজানে যে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেন—আজও তা অম্লান রয়েছে। শুধু উইম্বিলডন কেন—এই পাঁচ বছর পৃথিবীর যেখানে যত বিখ্যাত টেনিস প্রতিযোগিতা আছে তার সকল স্থানেই বিজয়িনী হিসাবে তিনি পেয়েছেন অকুণ্ঠ প্রশংসা—অজস্র অভিনন্দন। সুজানে হয়ে পড়েন দর্শক আকর্ষণের চুম্বক। যে প্রতিযোগিতায় যখনই তিনি খেলেছেন সেই প্রতি-যোগিতার কর্তৃপক্ষেরা অধিক দর্শক-আসনের ব্যবস্থা করেও অগণিত লোককে খেলা দেখাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন। রাজা পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরী পর্যন্ত সারা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন উইম্বিলডনে এই ফরাসী তরুণীর লীলাচঞ্চল খেলা দেখবার আশায়। সুজানের পোশাক, সুজানের জুতা, সুজানের মাথায় বাঁধা

ফিতা পর্যন্ত হয়ে পড়ে আদর্শ পোশাক। শুধু খেলোয়াড়রাই নয়, সাধারণ মহিলারাও সুজানের মত পোশাক পরে নিজেদের কৃতার্থ মনে করতে থাকেন।

১৯২৪ সালে সুজানের গৌরবোজ্জ্বল জীবনে এক বিষাদময় ইতিহাস সৃষ্টি হয়। এই সময়ে তাঁর পিতা গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সুজানে নিজেও অসুস্থতাবশতঃ অনুশীলনের অভাবে নিজেকে তৈরী করতে পারেন না। উইম্বিলডন প্রতিযোগিতা থেকে যখন আহ্বান আসে, তখন সুজানের পিতা তাঁকে নিষেধ করেন সেই বছর প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে। কিন্তু জয়ের উন্মাদনায় সুজানে জীবনে এই প্রথম পিতার অবাধ্য হন। অসুস্থ দেহ নিয়ে একাকী যাত্রা করেন উইম্বিলডনের পথে। কিন্তু এলিজাবেথ রেয়ানের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সেমি-ফ্যাইন্যাল খেলায় অতিকষ্টে জয়লাভ করে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন তিনি। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে অন্য কোন প্রতিযোগিতায় আর তাঁকে যোগদান করবার অনুমতি দেন না।

পিতার আশঙ্কা বর্ণে বর্ণে ফলে যায়। সুজানে নিজেও বুঝতে পারেন কতবড় অন্যায় তিনি করেছেন পিতার আদেশ অমান্য করে। এই অসুস্থতায় অনেকে মনে করেন যে টেনিস খেলা থেকে তাঁকে চিরবিদায় নিতে হলো। কিন্তু সেই সব ভবিষ্যদ্বাণী ও সমালোচনাকে ব্যর্থ করে পরের বছরই তিনি ফিরে আসেন নবতম প্রতিভায় টেনিস জগতকে উদ্ভাসিত করতে। দিকে দিকে আবার তাঁর জয়শঙ্খ বেজে ওঠে। ১৯২৫ সালে ফ্রান্সের সকল প্রতিযোগিতায় এবং উইম্বিলডনের সিঙ্গলস ও ডাবলস-এ আবার তিনি তাঁর জয়পতাকা উড়িয়ে দেন। রাজরাণী থেকে সুরু করে অগণিত সমর্থকেরা ফরাসী টেনিস-পটীয়সীকে ঘিরে আনন্দ-উৎসবে মত্ত হয়।

কিন্তু এই ১৯২৫ সালই সুজানের জীবনের সর্বশেষ গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এর পরেই তাঁর পিতা গুরুতরভাবে পীড়িত হয়ে পড়েন।

সকল উৎসাহ ও প্রেরণার উৎস যিনি, যিনি ছায়ার মত পাশে পাশে থেকে তাঁর আদরের কন্যাকে উৎসাহিত করেছেন, সেই পিতা ছাড়া সুজানেও খেলার মাঝে আর তেমন উৎসাহ পান না। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় টেনিস খেলা তাঁর কাছে প্রাণহীন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে হেলেন উইলিস নামে একজন আমেরিকান মহিলা টেনিসে ক্রমেই খ্যাতি লাভ করতে থাকেন। এই মহিলা পৃথিবীর অন্যান্য সকল মহিলা খেলোয়াড়কে একে একে পরাজিত করবার পর ঘোষণা করেন যে সুজানেকেও তিনি পরাজিত করতে পারেন। হেলেন উইলিসের এই দাম্ভিক ঘোষণায় সুজানের বন্ধু-বান্ধব সকলেই এর উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেবার জন্য সুজানেকে প্ররোচিত করতে থাকেন। পিতার অসুস্থতার জন্য তিনি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে রাজী হন না। কিন্তু যখন তাঁকে ভীরু, কাপুরুষ বলে অপবাদ দেওয়া হয়—বলা হয়, পরাজয়ের লাঞ্ছনার ভয়ে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে অনিচ্ছুক, তখন অশ্রুপূর্ণলোচনে অসুস্থ পিতার রোগশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তিন আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। সেই রোগশয্যা থেকে আদেশ করেন পিতা—'দাম্ভিক ঘোষণার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দাও'। দীর্ঘদিন অনুশীলন না করা অবস্থাতেই সুজানে, হেলেন উইলিসকে পরাজিত করে পুনরায় প্রমাণিত করেন যে তখনও তিনি টেনিস সম্রাজ্ঞী।

১৯২৬ সালে উইম্বিলডনে পরাজিত হবার পর সুজানে পেশাদার-বৃত্তি গ্রহণ করেন। অপূর্ব খেলার বিনিময়ে অজস্র অর্থ তিনি উপার্জন করতে থাকেন। কিন্তু এই পেশাদার-বৃত্তি গ্রহণ করবার পর ১২ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। ১৯৩৭ সালে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে অগণিত বন্ধু ও সংখ্যাতীত সমর্থকদের রেখে সেই টেনিস সম্রাজ্ঞী ইহলোক ত্যাগ করেন।

টেনিস খেলায় সুজানে ল্যাঙ্গলেন থেকে বড় প্রতিভা জন্মলাভ করেছে কি না, এ নিয়ে মতদ্বৈধতা থাকতে পারে। কিন্তু সুজানের

ব্যক্তিত্ব, তাঁর মধুর অমায়িক ব্যবহার, তাঁর ছন্দোময় ক্রীড়ানৈপুণ্য অন্যান্য যে কোন খেলোয়াড় থেকে বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, একথা আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন। তাই সুজানে ল্যাঙ্গলেন জনসাধারণের কাছে টেনিস সম্রাজ্ঞী—আগামী দিনের খেলোয়াড়দের কাছে তিনি রূপকথার রাজকুমারী।

রক্তমাংসের বাষ্পীয়যান এমিল জ্যাটোপেক

## এমিল জ্যাটোপেক

এক সৈনিক দৌড়িয়ে চলেছে। পায়ে তার নাল লাগানো ভারী বুট। পিঠে ঝোলা। অসমতল পাহাড়ের পথ বেয়ে, বনের পাশ দিয়ে, নদীর কোল ঘেঁসে এগিয়ে চলেছে সে। সঙ্গীহীন একাকী। দীপ্ত সূর্যের প্রখর তাপের মধ্যে হয়ত সুরু হয়েছে সেই সৈনিকের অনুশীলন। ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর মাঝে সূর্য যখন পশ্চিম-দিগন্তে ঢলে পড়েছে—কর্মক্লান্ত পৃথিবীর বুক থেকে বিদায়ের শেষ মুহূর্তে দিবাকর যখন তার ম্লান শেষ রক্তাভ রশ্মি ছড়িয়ে দিয়েছে তখনও সেই সৈনিকের দৌড় থামেনি। তারপর ধীরে ধীরে নিশীথিনীর কৃষ্ণাঞ্চলের মাঝে ঢাকা পড়েছে দিবসের শেষ আলোটুকু। নিশাচর পশু পাখীদের কোলাহলে যখন আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে গহন বনের মাঝে—সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মাঝেও শোনা গেছে সেই সৈনিকের পদশব্দ।

কত দর্শক দূর থেকে দেখে তাঁকে ব্যঙ্গ করেছে। বিকৃতমস্তিষ্ক বলে উপহাস করেছে। দৌড়ানোর ভঙ্গিমার মধ্যে কোন সাবলীলতা ও সৌন্দর্য নেই বলে অবহেলা করেছে। কিন্তু সেই সৈনিক ঐসব আলোচনা ও ব্যঙ্গকে উপেক্ষা করে এগিয়ে গিয়েছেন তাঁর যাত্রাপথে। দূরপাল্লার দৌড়ে সাফল্যের পথে—নব ইতিহাস সৃষ্টি করতে হলে কঠোর অনুশীলন ও অসীম কষ্টসহিষ্ণুতার প্রয়োজন, একথা সেই সৈনিক ভালো করেই জানতেন। তাই যখনই অবসর মিলতো, যেটুকু সময় পেতেন, সেই সময়টুকুর একমাত্র আনন্দ ছিল তার দৌড়ানোর মাঝে। দশ মাইল, পনরো মাইল, বিশ মাইল পর্যন্ত চলতো সেই অবিশ্রান্ত দৌড়ের কঠিন অনুশীলন।

ক্রমে ক্রমে চেকোশ্লোভাকিয়ার লোকেরা তাঁকে জানলো। ১৯৪৮ সালে চতুর্দ্দশ অলিম্পিকে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ১০,০০০ মিটার দৌড়ে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে যখন তিনি বিজয়ী হলেন তখন

জানলো তাঁকে দেশবিদেশের লোকেরা। তারপর ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ৫,০০০ মিটার, ১০,০০০ মিটার এবং ম্যারাথন দৌড়ে বিজয়ীর মঞ্চে যখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন তখন দৌড়ের বিস্ময়, নব-ইতিহাসের স্রষ্টা এবং 'রক্তমাংসের বাষ্পীয়যান' নামে অভিহিত করলো তাঁকে বিশ্বের অগণিত নরনারী। পঞ্চদশ অলিম্পিকে নতুন নামকরণ করলো জনসাধারণ ঐ বিজয়ী বীরের নামে—'হেলসিঙ্কি অলিম্পিক'—জ্যাটোপেকের অলিম্পিক।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। স্বামীর কৃতিত্বে উদ্বেলিত হৃদয়ে দৃঢ়পাদক্ষেপে এগিয়ে এলেন ঐ দৌড়বীরের সাধ্বী স্ত্রী। সহধর্মিণী শুধু নয়, সহকর্মিণী হিসাবে স্বামীর গৌরবকে আরও মহিমান্বিত করবার জন্যে এগিয়ে এলেন বর্শা হাতে বীর নারী। বর্শা ছুঁড়ে দিলেন প্রিয় স্বামীকে স্মরণ করে। ঝলসিয়ে উঠলো সূর্য-কিরণে সেই বর্শাফলক। তীরবেগে এগিয়ে চললো বর্শা। শ্যামল কোমল দূর্বাদলের মধ্যে যখন সেই শাণিত বর্শার মুখ যেয়ে বিঁধলো মাটিতে, তখন বিচারকেরা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইলেন সেই কম্পমান বিদ্ধ বর্শার দিকে। ঘোষণা করা হলো—বর্শা-নিক্ষেপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নূতন অলিম্পিক রেকর্ড। স্বামী স্ত্রী উভয়ে উভয়ের গৌরবে আলিঙ্গন করলেন একে অপরকে। উপস্থিত জনতা হৃদয়ের সকল শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা উজাড় করে সম্বর্ধনা করলো—কণ্ঠের শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষ করে ঐ বীর দম্পতিকে তারা জানালো অভিনন্দন।

হেলসিঙ্কিতেই জ্যাটোপেকের জয়যাত্রার গতি রুদ্ধ হলো না। এই সাফল্যে দৌড়বীর পেলেন আরও উৎসাহ আরও প্রেরণা। কঠিন থেকে কঠিনতম অনুশীলনের মাঝে তাঁর কাটতে লাগলো দৈনন্দিন জীবন। ১৯৫৪ সালের শেষাশেষি বিভিন্ন দৌড়ে আটটি বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হিসাবে ঘোষণা করা হলো তাঁর নাম। দূরপাল্লার দৌড়ে এই শ্রেষ্ঠ বীরকে ১৯৫২ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে 'অর্ডার অব্ রিপাবলিক' উপাধিতে ভূষিত করা হলো। ১৯৫৩ সালের

শেষাশেষি তিনি নিজের দেশ থেকে খেলাধুলার শ্রেষ্ঠ সম্মান 'অনার্ড মাস্টার অব্ স্পোর্টস' উপাধি লাভ করলেন। সামরিক জীবনেও পেলেন পদমর্যাদা। সৈনিকেরা তাঁকে দেখলেই তুই পায়ের বুটে শব্দ করে ডান হাত কপালে ঠেকিয়ে অভিবাদন করতে থাকলো তাদের প্রিয় 'লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেলকে'। চেকোশ্লোভাকিয়ার কৃষক, মজুর থেকে সুরু করে সকল শ্রেণীর খেটে-খাওয়া মানুষের কাছে তিনি হয়ে পড়লেন উপাস্য দেবতার মত। সকলেই ঐ দৌড়বীরকে আদর্শ করে নিজের উন্নতি লাভের পথ খুঁজে নিতে লাগলো।

চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্গত মোরাভিয়ার এক সাধারণ কৃষক পরিবারে ১৯২২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর জ্যাটোপেকের জন্ম হয়। তাঁর পিতা একজন ছুতার মিস্ত্রী ছিলেন। অবসর সময়ে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য জ্যাটোপেক এক স্কুলে ভর্তি হন। নিজের রোজগার থেকে কিছু অর্থ বাঁচিয়ে লেখাপড়ার খরচ চলতে থাকে। এই স্কুলের পাঠ শেষ করে বৈদেশিক ভাষাসমূহ ও রসায়ন-শাস্ত্রে অধিক জ্ঞানলাভের জন্য তিনি উচ্চতর স্কুলে প্রবেশ করেন। বিজ্ঞানের ওপর বিশেষ আকর্ষণ থাকায় শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁর আগ্রহের সৃষ্টি হয় এবং এ বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য তিনি নিয়মিত পড়াশুনা করতে থাকেন। এই সময় থেকেই তাঁর দৌড়ানোর প্রথম পাঠ সুরু হয়। স্বল্প দূরত্বের দৌড় থেকে দূরপাল্লার দৌড়ই তাঁর আনন্দ বা আকর্ষণ ছিল বেশী। কোন শিক্ষকের সাহচর্য ছাড়াই জ্যাটোপেকের প্রতিভার বিকাশ হতে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিশ্রান্ত দৌড়ের অভ্যাস করে তিনি সারা বিশ্বের আলোচনার বস্তু হয়ে ওঠেন। কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে নিয়মিত এরূপ কঠোর দৌড়ানোর অনুশীলন করা সম্ভব নয় বলে যখন দেশ-বিদেশের লোকেরা সমালোচনা সুরু করেন তখন চিকিৎসকেরা তাঁকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে অভিমত প্রকাশ করেন যে তিনি সাধারণ মানুষ ছাড়া কোন অতিমানবীয় বা আসুরিক শক্তির অধিকারী নন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে জিলিন-এর

(বর্তমানে গোটওয়াল্ডের) 'বাটা' জুতা কোম্পানীতে জ্যাটোপেক চাকুরী করতেন।

কিছুদিন দৌড়ের অভ্যাস করবার পর জ্যাটোপেক বুঝতে পারেন যে দূরপাল্লার দৌড়ে প্রচলিত নিয়মে অনুশীলন করলে কোন ঐতিহাসিক সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। দূরপাল্লার দৌড়ে প্রচলিত রীতি ছিল যে প্রথমে কয়েকপাক কমবেগে দৌড়াবার পর ধীরে ধীরে গতিবেগ বৃদ্ধি করা। এই নিয়ম জ্যাটোপেকের মনঃপূত হয় না। তিনি নিজের উদ্ভাবিত নিয়মে অনুশীলন করতে থাকেন। তাঁর নিয়মটি ছিল—সুরু থেকেই যতখানি সম্ভব তীব্রভাবে দৌড়াতে হবে, এইভাবে কিছুক্ষণ দৌড়ানোর পর যখন ক্লান্তি বোধ হবে, তখন নিজের গতিকে একটু মন্থর করে দিয়ে কিছুটা ক্লান্তি ও অবসাদ থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় শেষ সীমারেখা পর্যন্ত তীব্রগতিতে দৌড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। এই নতুন নিয়মে ১০ থেকে ২০ মাইল পর্যন্ত প্রথম প্রথম দিনে একবার এবং কিছুদিন পরে দিনে তুইবার তিনি অতিক্রম করতে থাকেন।

এরূপ কঠোর সাধনার ফল অচিরেই দেখা দেয়। চেকোশ্লো-ভাকিয়ায় জ্যাটোপেক হয়ে পড়েন দূরপাল্লার দৌড়ের একমাত্র বিজয়ী বীর। ১৯৪১ সালে জীবনে প্রথম দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে ১,৫০০ মিটার দৌড়ে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এই বছরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করায় চেকোশ্লোভাকিয়ার ১,৫০০ মিটার দৌড়বীরদের ক্রমপর্যায়ে তাঁর নাম ২৬ জনের পর দেখা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরুতে তিনি 'চেক আর্মিতে' প্রবেশ করেন। ১৯৪৬ সালে ২৪ বছর বয়সে জ্যাটোপেক প্রাগে অনুষ্ঠিত জাতীয় এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় ৫,০০০ মিটার দৌড়ে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। ঐ একই দূরত্বের দৌড়ে বার্লিনে পুনরায় সাফল্য লাভ করলেও ওসলোতে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপে পঞ্চম স্থানের অধিকারী হন। ১৯৪৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিকে ওয়েম্বলী

স্টেডিয়ামে ১০,০০০ মিটার দৌড় ২৯ মিঃ ৫৯'৬ সেকেণ্ডে ( অলিম্পিক রেকর্ডে ) অতিক্রম করে যেদিন তিনি বিজয়ীর পুরস্কার লাভ করেন সেইদিনই তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা উচ্চ আশা প্রকাশ করেন। ১৯৫০ সালে ব্রুসেলসে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় ৫,০০০ ও ১০,০০০ মিটার দৌড়ে তাঁকে পরাজিত করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয় না। এর পর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও বিখ্যাত প্রতিযোগিতায় অসংখ্য পুরস্কার তিনি একে একে ঘরে এনে তুলতে থাকেন।

১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে দূরপাল্লার দৌড়ে নব ইতিহাসের স্রষ্টা হিসাবে জ্যাটোপেকের নাম লিখিত হয়। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে ৫,০০০ মিটার, ১০,০০০ মিটার এবং ম্যারাথন দৌড়ে বিজয়ীর স্বর্ণপদক তাঁর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। শুধু স্বর্ণপদক নয়, ঐ তিনটি দূরত্ব অতিক্রমের সময়ও নূতন অলিম্পিক রেকর্ড হিসাবে গৃহীত হয়। কিন্তু এই সাফল্যেই তিনি তৃপ্ত হন না। আরও সাফল্য চাই। আরও কম সময়ে বিভিন্ন দূরত্ব অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে সম্ভব, এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে স্থাপন করবার জন্য তিনি আরও অনুশীলন সুরু করেন। এই দুশ্চর তপস্যায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। ১৯৫৪ সালের শেষাশেষি দূরপাল্লার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ডের যে ডালি নিয়ে তিনি বিশ্ব-সভায় উপস্থিত হন তা যে কোন একক মানুষের পক্ষে ছিল অকল্পনীয়। তাঁর রেকর্ডগুলি ছিল—

১০,০০০ মিটার দৌড়—২৮ মিঃ ৫৪'২ সেঃ
১৫,০০০ মিটার দৌড়—৪৪ মিঃ ৫৪'৬ সেঃ
২০,০০০ মিটার দৌড়—৫৯ মিঃ ৫১'৮ সেঃ
২৫,০০০ মিটার দৌড়—১ ঘঃ ১৯ মিঃ ১১'৮ সেঃ
৩০,০০০ মিটার দৌড়—১ ঘঃ ৩৫ মিঃ ২৩'৮ সেঃ
৬ মাইল দৌড়—২৭ মিঃ ৫৯'২ সেঃ
১০ মাইল দৌড়—৪৮ মিঃ ১২ সেঃ
১৫ মাইল দৌড়—১ ঘঃ ১৬ মিঃ ২৬'৪ সেঃ

এবং ১ ঘণ্টায়—২০,০৫২ মিটার অতিক্রম করা। দৌড়ের ইতিহাসে জ্যাটোপেকের এই অমর অবদান কোনদিন মানুষের পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হবে না।

এমিল ও ডানা আদর্শ দম্পতি। ডানা—এমিল জ্যাটোপেকের কমাণ্ডিং অফিসারের কন্যা। ১৯৪৬ সালে তাঁদের প্রথম পরিচয় হয় এবং ১৯৪৮ সালের শরৎকালে তাঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। দুজনেই সমবয়সী। ১৯২২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর দুজনেই পৃথিবীর প্রথম আলো দেখবার সুযোগ লাভ করেন। এই বিবাহের পরেই জ্যাটোপেককে জুনিয়ার অফিসার ট্রেনিং-এর জন্য দূরে চলে যেতে হয়। ফলে, বিবাহের পর 'মধু চন্দ্রিমা' যাপনের সুযোগ তাঁদের ঘটে না।

ছেলেবেলা থেকেই জ্যাটোপেক বাঁ হাতে লিখতেন এবং বাঁ হাতে লেখবার জন্য পিতার কাছে তাঁর বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়। আজও বেশিরভাগ কাজ করবার সময় স্বভাবতই তাঁর বাঁ হাতটা আগে যায়।

ডানা শিক্ষয়িত্রীর কাজ করলেও অবসর সময়টুকু গান-বাজনার মাঝে কাটাতেই স্বামী-স্ত্রী ভালবাসেন। গিটারে এমিলের হাত যেমন চমৎকার তেমনি ডানার কোমল আঙ্গুলগুলির স্পর্শে বেহালার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সুরের অপূর্ব মূর্ছনার সৃষ্টি হয়। জ্যাটোপেক দাবা ও ভলিবল খেলতে ভালবাসেন। ডানা সম্প্রতি ধনুর্বিদ্যা সুরু করেছে এবং একদিন তিনি ধনুর্বিদ্যায় জগৎজোড়া সম্মান লাভ করতে পারবেন বলে আশা করেন।

সামরিক বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হলেও জ্যাটোপেক বা তাঁর স্ত্রীর এমন একটি দিনও যায় না যেদিন তাঁরা অনুশীলন-ক্ষেত্রে উপস্থিত হন না। দেশের সকল শ্রেণীর লোকের কাছে তাঁরা আদর্শ। দৌড়ে বা বর্শা ছোঁড়ায় উন্নতি লাভের জন্য যে কোন সাহায্যই জ্যাটোপেক ও তাঁর স্ত্রী অকৃপণ হস্তে দান করে থাকেন। এই দানের কোন গণ্ডি নেই। সারা বিশ্বে সকল দেশের মানুষের মাঝে

তাঁদের অকৃপণ দানের গণ্ডি পরিব্যাপ্ত। জ্যাটোপেক প্রবর্তিত দূরপাল্লার দৌড়ের নতুন পদ্ধতি আজ সকল দৌড়বীরই গ্রহণ করে নিয়েছেন। এই বিনয়ী, নম্র, নিরহঙ্কার, খেলাধুলার আদর্শ পূজারী দম্পতি শান্তির শ্বেত পারাবত উড়িয়ে দিয়েছেন খেলাধুলার মাধ্যমে। সেই পারাবাত আজ উড়ে চলেছে দেশ থেকে দেশান্তরে শান্তির বাণী বহন করে। খেলাধুলার মাধ্যমে জাতিতে জাতিতে মিলনের গ্রন্থি দৃঢ়তর হয়, একথা তিনি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেন। তাই বলেছেন—

"I want to contribute as much as possible, with all my activities, to such a friendship and understanding among nations as we witnessed at the Olympic Games. I am happy to say that this endeavour of mine is in complete harmony with the education of all young people in Czechoslovakia. Our youth is brought up to respect the equality of all nations of the world."

১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে এই বিশ্ববন্দিত এ্যাথলেট সস্ত্রীক ভারত সফরে আসেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রদর্শনী দৌড় ও বর্শা ছোঁড়া ছাড়াও তাঁরা কয়েকটি প্রতিযোগিতাতে অংশ গ্রহণ করেন। নিরভিমান স্পষ্টবাদী ও খেলাধুলার আদর্শ পূজারী জ্যাটোপেক ভারতের খেলাধুলার প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা মহানগরীতে এসে একটি স্টেডিয়ামও না দেখতে পাওয়ায় বিশেষ দুঃখিত হন। তিনি বলেন, "বিশ্ব খেলাধুলার আসরে ভারত যদি তার সুনামকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহলে হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তার মত স্টেডিয়ামের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করতে হবে—গড়ে তুলতে হবে স্টেডিয়াম শহরে-শহরে, শহরের উপকণ্ঠে, এমন কি কিছু কিছু গ্রামের মধ্যেও।"

## জনি উইসমুলার

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে যে ছায়াচিত্র দেখে মনে শিহরণ জেগেছে; বাঘ, সিংহ, হাতী, গণ্ডার প্রভৃতি শ্বাপদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যে ছবির নায়কের কেটেছে দৈনন্দিন জীবন; বিপন্নকে উদ্ধার করতে পাহাড়ের চূড়া থেকে যিনি স্রোতস্বতী নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন—লতাগুল্মের সাহায্যে এক বৃক্ষ থেকে অন্য বৃক্ষে আরোহণ করে বন্য জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করেছেন—দর্শকচিত্ত জয় করেছেন অসীম বীরত্ব-গৌরবে, সেই পরম শক্তিমান অভিনেতার পরিচয় জানবার আগ্রহ খুবই স্বাভাবিক। শুধু কি বীরত্বেরই কাহিনী! এমন অপূর্ব অভিনয়-দক্ষতাই বা আছে কয়জনের? প্রেম ও হিংসার দ্বন্দ্বের বিচিত্র কাহিনী আর বীরত্ব-গৌরবে অতুলনীয় টার্জনের বিভিন্ন ছায়াছবি চলচ্চিত্র জগতের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। টার্জনের এই বিস্ময়কর ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছেন তিনি এক সন্তরণবীর—জনি উইসমূলার। ছায়া ও কায়ায় সর্বজনের আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ—জল ও স্থলের শৌর্যময় বীর। আমেরিকা তথা বিশ্বের সন্তরণ-বীরদের আদর্শ।

৬৭টি সন্তরণ রেকর্ডের অপূর্ব গৌরবের তিনি অধিকারী। ৫০ গজ থেকে আধ মাইল সন্তরণের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তিনি একচ্ছত্র সম্রাট। ১৯২৪ সালে অষ্টম অলিম্পিকে মাত্র ১৬ বছর বয়সে সন্তরণের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সর্বপ্রথম একাকী তিনটি স্বর্ণপদক লাভ করে তিনি সৃষ্টি করেন এক নতুন ইতিহাস। ১৯২৮ সালে আমস্টার্ডাম অলিম্পিকেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কাছে সবাইকে মাথা নত করতে হয়।

সন্তরণের এই বিস্ময়কর প্রতিভার আত্মপ্রকাশ কিন্তু স্বাভাবিক ঘটনা নয়। শৈশবে উইসমূলার অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। তাই বিভিন্ন চিকিৎসার পর ভগ্ন ও দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী উইসমূলারকে ডাক্তার যেদিন বলেন যে সাঁতারই তাঁর সুস্থ ও সবল দেহলাভের একমাত্র

পথ, সেদিন উইসমূলার ভয় ও ঘৃণার সঙ্গে সেই উপদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসক অসন্তুষ্ট হয়ে ভর্ৎসনা করায় উইসমূলার অশ্রুপূর্ণলোচনে ও ভীতিবিহ্বলকণ্ঠে বলেছিলেন, "আমি যে জীবনে কখনো জলে নামিনি ডাক্তারবাবু, সাঁতার আমি কি করে কাটবো?" তবুও ডাক্তারের উপদেশে এবং পিতামাতার অনুরোধে তাঁকে জলে নামতে হয়।

১৩ বছর বয়সে বাড়ির কাছে ডেসক্লেনস নদীর কিনারায় ঘোলাটে জলে প্রথম প্রথম দুচার মিনিটের জন্য অত্যন্ত বিরক্তি ও ভয়ের সঙ্গে একটু হাত-পা নেড়ে তিনি জল থেকে উঠে আসতেন। ক্রমে একটু বেশী সময় জলে থাকতে আরম্ভ করলেন। বিরক্তি কেটে গেল—তাঁর বদলে এলো আসক্তি। ভয়ও আর নেই, ভয়ের বদলে এসেছে ভালবাসা। নিজের চেষ্টাতেই শিখে নিলেন সাঁতার। যে জলকে এতদিন তিনি ভয় করতেন সেই জলের বুকেই তাঁর দিনের সবচেয়ে বেশী আনন্দের সময়টুকু কাটতে থাকে। আস্তে থেকে জোরে এবং তীব্র থেকে তীব্রতর গতিবেগে উইসমূলার সাঁতার কাটতে সুরু করেন। মিচিগ্যান হ্রদে দক্ষ সাঁতারুদের সাঁতার দেবার কৌশল তিনি দূরে বসে একমনে দেখতেন আর সেই কৌশলগুলি নিজে আয়ত্ত করে অনুশীলন করতেন। এইভাবে ধীরে ধীরে নিজের চেষ্টাতেই সন্তরণের বিভিন্ন কৌশল তাঁর করায়ত্ত হয়।

উইসমূলারের বিজ্ঞানসম্মত সন্তরণের প্রকৃত শিক্ষা সুরু হয় 'ইলিনিয়াস এ্যাথলেটিক ক্লাবে' বিল বেচারাকের কাছে। গুরুর উন্নত শিক্ষায় তাঁর প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। ১৯২১ সালে ১৬ বছর বয়সে আমেরিকার জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম অবতীর্ণ হন। এই প্রতিযোগিতার প্রত্যেকটি বিভাগে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সাঁতারুদের মধ্যে এমন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো যে কোন্ বিভাগে কে জয়লাভ করবেন সে কথা প্রতিযোগিতা শেষ হবার আগে কারো পক্ষেই বলা সম্ভব হতোনা। সন্তরণ-জগতে

অপরিচিত উইসমূলার যখন এই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন তখন তাঁর সাফল্য সম্বন্ধে তাঁর শিক্ষক ছাড়া অন্য কারো মনে কোনরূপ আশা ছিল না। কিন্তু প্রতিযোগিতা শেষ হবার পর দেখা গেলো সন্তরণ জগতের অখ্যাত ছেলে উইসমূলার সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিযোগিতা ৫০ গজ ও ২২০ গজ সাঁতারে বিজয়ী হয়েছেন।

উইসমূলারের নাম ক্রমেই সারা আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। নিয়মিত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর প্রতিভাকে আরও উন্নত করবার জন্যে কঠোর সাধনা সুরু করেন। এই সাধনার ফল অচিরেই দেখা দেয়। আমেরিকার সন্তরণ-জগতে এমন এক নতুন প্রতিভার আত্মপ্রকাশ হয় যিনি আগের সকল রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়ে নতুন নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন। ৫০ গজ থেকে ৮৮০ গজ পর্যন্ত সাঁতারের বিভিন্ন নতুন রেকর্ডের পাশে উইস-মূলারের নাম খোদিত হয়। শুধু মাত্র ফ্রি-স্টাইল সাঁতারেই এই রেকর্ডগুলি সীমাবদ্ধ থাকে না, ব্যাক স্ট্রোক বা পীঠ সাঁতারেও অনেক রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

সন্তরণের বিভিন্ন বিভাগে আমেরিকায় তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত হলেও অলিম্পিকের ১০০ মিটার সাঁতারে তখনও কোরিয়ার সাঁতারু ডিউক কোহানামাকোর আসন প্রতিষ্ঠিত। ১৯১২ সালে স্টকহলমে অনুষ্ঠিত পঞ্চম অলিম্পিকে এবং ১৯২০ সালে এন্টোওয়ার্পে সপ্তম অলিম্পিকে কোহানামাকো ১০০ মিটার সাঁতারে শুধু মাত্র বিজয়ীর সম্মানই লাভ করেন না; ঐ দুটি অলিম্পিকেই তাঁর সময় নূতন অলিম্পিক রেকর্ড হিসাবে গৃহীত হয়। যাই হোক, ১৯২৪ সালে প্যারিস অলিম্পিকে যখন উইসমূলার ও কোহানামাকো অবতীর্ণ হন তখন শুধু মাত্র আমেরিকার জনসাধারণ নয়, সারা বিশ্ব প্রবীণ ও নবীনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ সেই ফলাফল জানবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। সাঁতার আরম্ভের সঙ্কেত পাবার সঙ্গে সঙ্গে উইসমূলার এগিয়ে যান তীব্র গতিবেগে। ডিউক প্রাণপণ চেষ্টা

করেও উইসমূলারকে ধরতে পারেন না। মাত্র ৫৯ সেকেণ্ডে ডিউককে পেছনে ফেলে তিনি ১০০ মিটার অতিক্রম করেন। ৪০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলেও তাঁর গতিবেগের কাছে সকলে পরাজিত হয়। মাত্র ৫ মিনিট ৪'২ সেকেণ্ডে তিনি ঐ দূরত্ব অতিক্রম করেন। ১০০ মিটার ও ৪০০ মিটারে প্রথম স্থান অধিকার করা ছাড়াও ৮০০ মিটার রিলে রেসেও আমেরিকা দলকে জয়লাভের সর্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করেন তিনি। অলিম্পিকের সন্তরণ-ইতিহাসে তিনটি স্বর্ণপদক লাভের কীর্তি তাঁর দ্বারাই সর্বপ্রথম অর্জিত হয়।

১৯২৪ সালের অলিম্পিকে এরূপ সাফল্য অর্জন করায় তাঁর নাম আমেরিকার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। নিজের অমায়িক মধুর ব্যবহারে তিনি সমস্ত আমেরিকাবাসীর মন জয় করে নেন। তাই ১৯২৮ সালে আমস্টার্ডাম অলিম্পিকে আমেরিকার যে বিরাট দলটি যোগদান করে সেই দলের নেতৃত্বের গুরুদায়িত্বভার উইসমূলারকে দেওয়া হয়। ১৯২৮ সালের অলিম্পিকে ১০০ মিটার সাঁতারে নিজের পূর্বতন রেকর্ডকে ভঙ্গ করে মাত্র ৫৮'৬ সেকেণ্ডে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার তিনি বিজয়ীর স্বর্ণপদক লাভ করেন। ৮০০ মিটার রিলে রেসেও আমেরিকা পুনরায় তাঁর কৃতিত্বের জন্যই সাফল্য লাভে সমর্থ হয়।

১৯২৯ সাল পর্যন্ত উইসমূলার সন্তরণে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রেখে প্রতিযোগিতামূলক সন্তরণ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান সন্তরণবীর কায়াতে দর্শকচিত্ত জয় করে ছায়াতে অবতীর্ণ হন। টার্জনের বিভিন্ন ছায়াছবির নামভূমিকায় তাঁর অপূর্ব অভিনয় সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ছায়া ও কায়াতে উইসমূলারের কীর্তি কোন দিন ম্লান হবে না। সন্তরণ-জগতে দ্রুতগতি বহু সন্তরণবীরের আবির্ভাব হচ্ছে। উইসমূলারের সন্তরণের বিভিন্ন রেকর্ড আজ আর গৌরবে মাথা উঁচু করে নেই। তবুও তাঁর সন্তরণের দৃপ্তভঙ্গিমা, জলের বুকে আলোড়ন

তুলবার অপূর্ব কৌশল, সাবলীল গতিবেগ যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে আজকের দ্রুতগতি সাঁতারুদের সাঁতার মনের মধ্যে গভীরভাবে রেখাপাত করে না। উইসমূলারের সেই প্রাণবন্ত মনমাতানো সাঁতার তাঁরা আজকের সাঁতারুদের মধ্যে দেখতে পান না।

টেবিলটেনিসে বিশ্ববিমোহিনী এঞ্জেলিকা রোজেনু

## এঞ্জেলিকা রোজেনু

বিভিন্ন খেলাধুলায় যে সব মহিলা তাঁদের বিস্ময়কর প্রতিভায় স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন, টেবিল টেনিস খেলোয়াড় এঞ্জেলিকা রোজেনু তাঁদের অন্যতম। টেবিল টেনিস ইতিহাসে মহিলাদের মধ্যে এত বড় প্রতিভার কখনো আবির্ভাব হয়নি। বিশ্বের সকল বিখ্যাত প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে তিনি তাঁর বিজয়কেতন উড়িয়েছেন দেশে দেশে—দিকে দিকে। বিশ্ব টেবিল টেনিসে মহিলাদের সিঙ্গলস-এ উপর্যুপরি ছয় বছর বিশ্বের পটীয়সী মহিলা খেলোয়াড়েরা তাঁর অনুপম খেলার কাছে নতি স্বীকার করেছে। মহিলাদের ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস খেলাতেও তিনি তাঁর অবিস্মরণীয় ক্রীড়াচাতুর্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। আজ ৩৭ বছর বয়সেও রোজেনু দেদীপ্যমান প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। মহিলাদের টেবিল টেনিসে রোজেনু আজও অনন্যা। অপরাজিতা না হলেও অনুপমা। নমনীয়, কোমল ও কৃশ-তনু হলেও খেলার টেবিলে তিনি ভীষণা।

নয় বছর বয়সে রোজেনুর টেবিল টেনিস খেলার হাতেখড়ি হয়। ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে প্রতিভার স্ফূরণ হতে থাকে। টেবিল টেনিস নৈপুণ্যের নবতম বর্ণসুষমায় বিস্মিত হয় রুমানিয়ার জনসাধারণ। 'কর্বিলন কাপে' জাতীয় স্বার্থরক্ষার খাতিরে ১৪ বছর বয়সের এই বালিকার সাহায্যের স্মরণাপন্ন হতে হয় রুমনিয়াকে। রোজেনুর তীব্র আক্রমণাত্মক খেলা দেশ-বিদেশের খেলোয়াড়দের কাছে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা থেকে আহ্বান আসতে থাকে রোজেনুর কাছে। বিজয়লক্ষ্মীও ছুটে চলেন টেবিল টেনিসের এই আদর্শ পূজারিণীর যাত্রাপথ ধরে। বহু পুরস্কার তাঁর করায়ত্ত হয়। কিন্তু বিশ্ব টেবিল টেনিসের কোনও পুরস্কার রোজেনু ঘরে তুলতে পারেন নি ১৯৫০ সালের আগে। তাই দুর্বার বাসনায় অনুপ্রাণিত

হয়ে ১৯৫০ সালে তিনি এসে হাজির হন টেবিল টেনিসের বিশ্ব-দরবারে। মহিলাদের সিঙ্গলস-এ সকল দেশের সকল মহিলা খেলোয়াড়ের ক্রীড়াচাতুর্য নিষ্প্রভ হয়ে যায় নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত রোজেন্নুর কাছে। পরাজয়ের গ্লানি নতমস্তকে সহ্য করতে বাধ্য হয় সকল নবীনা ও প্রবীণা। বিজয়ীর পুরস্কার 'জি জিষ্ট প্রাইজ' রোজেন্নুর হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহিলা টেবিল টেনিস খেলোয়াড় বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাঁকে। এর পর মহিলাদের সিঙ্গলস-এ তাঁর জয়-রথ ছুটে চলে সম্মুখের সকল বাধা-বিপত্তিকে তুচ্ছ করে। দীর্ঘদিন ধরে কঠোর অনুশীলন করে টেবিল টেনিসে কীর্তিমতী কত মহিলা রোজেন্নুর বিরুদ্ধে অবতীর্ণা হন, কিন্তু তাঁর ব্যাকহ্যাণ্ড ও ফোরহ্যাণ্ড মারের তীব্রতায়, বন্যার জলোচ্ছাসে তৃণখণ্ডের মত ভেসে যায় বিপক্ষের সকল কলা-কৌশল। উপর্যুপরি ছয় ছয়বার রোজেন্নু হাসিমুখে গ্রহণ করেন বিশ্ব-বিজয়িনীর পুরস্কার 'জি জিষ্ট প্রাইজ'। ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত হাঙ্গেরীর মিস এম মোডানিস্কি উপর্যুপরি পাঁচ বছর বিশ্ব-বিজয়িনী হয়ে যে রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেই রেকর্ড ম্লান হয়ে যায়। মহিলাদের সিঙ্গলস-এ নবতম রেকর্ডের স্রষ্টা হিসাবে রোজেন্নুর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়। রোজেন্নু শুধু একক খেলাতেই অনন্যা নন। পুরুষ ও মহিলা সঙ্গীদের পাশেও তিনি অনুপমা। তাই মহিলাদের ডাবলস-এ ১৯৫৩, ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে এবং মিক্সড ডাবলস-এ ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত উপর্যুপরি তিন বছরের বিজয়ীর তালিকায় পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁর নাম দেখা যায়।

আজ বিশ্ব টেবিল টেনিসে মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতায় রুমানিয়ার আসন অন্যান্য সকল দেশের পুরোভাগে। পাঁচবার দলগত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর পুরস্কার 'কর্বিলন কাপ' নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে রুমানিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করেছে—প্রতিষ্ঠিত করেছে নবতম রেকর্ড। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহিলা টেবিল

টেনিস খেলোয়াড়-প্রসবিনী বলে যে দেশ গর্ব করছে, ১৯৫০ সালের আগে কর্বিলন কাপের বিজয়ীর তালিকায় সেই দেশের নাম খুঁজে পাওয়া যায় নাই। ১৯৫০ সাল থেকে কর্বিলন কাপ বিজয়ী হয়ে রুমানিয়া সেই অবিস্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টির অধিকারী। রুমানিয়ার সেই স্মরণীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সর্বপ্রথম যে মহিলা খেলোয়াড়ের ভাস্বর প্রতিভা চোখে পড়ে—যাঁর অকৃপণ দানের কথা বার বার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে, তিনি হলেন এঞ্জেলিকা রোজেনু। নিজের অপূর্ব খেলার মাঝেই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকেন নি—দেশকেও করেছেন বরণীয়। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে বিশ্ব টেবিল টেনিসের বিভিন্ন বিভাগে মোট ১৭টি বিজয়ীর পুরস্কার রোজেনু লাভ করেছেন। এই ১৭টি পুরস্কার লাভ করতে তাঁকে ১১৩ টি সেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। মাত্র ১১টি সেট ছাড়া অন্যান্য সকল সেটেই তিনি হয়েছেন বিজয়িনী। রোজেনুর অবিস্মরণীয় প্রতিভার সাক্ষ্য হিসাবে এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্তের বোধ হয় প্রয়োজন নেই।

আর পাঁচজনের মত রোজেনুরও স্বামী, কন্যা নিয়ে সুখের সংসার। তাঁর স্বামী একজন কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। কন্যা তাঁরই অনুগামী। ১০ বছর বয়সেই সে টেবিল টেনিসে হাত পাকিয়েছে। বুখারেস্টের একটি বিখ্যাত সংবাদপত্রের ক্রীড়া-সাংবাদিকের গুরুদায়িত্ব রোজেনুর উপর ন্যস্ত। একমাত্র আদরের কন্যার লেখাপড়া ও খেলাধুলার বিষয়ে তিনি সব সময়ই সচেতন। তাই মাতা ও কন্যাকে অনেক সময়ে একসঙ্গে সাইকেল চালাতে, সাঁতার কাটতে বা নৌকা চালাতে দেখা যায়। রোজেনু আশা করেন, তাঁর কন্যাও একদিন টেবিল টেনিসে সুনাম অর্জন করতে পারবেন। কন্যার টেবিল টেনিসের কঠিনতম শিক্ষা চলছে আজ মায়ের কাছে।

বুখারেস্ট শহরের একটি সুন্দর সুসজ্জিত ফ্ল্যাট বাড়ি রোজেনুর আবাসস্থল। ছোট্ট শান্তির সংসার। রোজেনুর বাড়িতে ঢোকবার

পথে প্রথমেই যে বড় ঘরটি আপনার চোখে পড়বে, সেখানে দেখতে পাবেন সুন্দর করে সাজানো রয়েছে অসংখ্য কাপ, শীল্ড, মেডেল আর নানা ধরনের নানা আকৃতির পুরস্কার। আর একটু নজর করলে দেখতে পাবেন প্রত্যেকটি পুরস্কারের নিচে ছোট করে একটু বিবরণ দেওয়া আছে। আপনার মনে হবে, হয়ত কোন যাদুঘরে এসে ঢুকে পড়েছেন।

খেলার টেবিলে রোজেনুর পদক্ষেপ এত ক্ষিপ্র ও তাঁর দেহের ভঙ্গিমা এত সাবলীল যে বিপক্ষের মার যত কঠিন হোক না কেন —বা বল যত জোরেই আসুক না কেন, রোজেনু নিখুঁতভাবে সেই বলটিকে পুনরায় বিপক্ষের দিকে ফেরত পাঠাতে পারেন। 'আক্রমণই শ্রেষ্ঠ রক্ষণ'—খেলার এই মন্ত্রে তিনি বিশ্বাসী, তাই তাঁর খেলার মাঝে দুর্বার আক্রমণের অভিব্যক্তি। প্রয়োজনবোধে অবশ্য রক্ষণমূলক খেলাতেও তিনি অপটু নন। সাধারণতঃ দেশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ খেলোয়াড়দের সঙ্গে তিনি নিয়মিত কঠিন অনুশীলন করে থাকেন। কখনো অল্প অসুস্থ হলে বা তাঁর ডাক্তার বিশ্রাম নিতে উপদেশ দিলেও রোজেনু, টেবিল টেনিসের ব্যাট-বল ছাড়া স্থির থাকতে পারেন না। তাঁকে দেখা যায়, একটা বল আর ব্যাট নিয়ে একা একাই দেওয়ালের গায়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেরে চলেছেন। দীর্ঘ ছয় বছর বিশ্ব টেবিল টেনিসের মহিলাদের সিঙ্গলস-এ বিজয়কেতন উড়িয়ে তিনি টোকিওতে সদ্য অনুষ্ঠিত বিশ্বপ্রাধান্য প্রতিযোগিতায় জাপানের এক অখ্যাতনামা মহিলার কাছে অভাবনীয় ও অত্যাশ্চর্য-ভাবে পরাজিত হয়েছেন সত্য, কিন্তু তাঁর প্রতিভা যে আজও নিম্নমুখী নয় এ সত্যকে তিনি প্রমাণিত করেছেন কর্বিলন কাপ ও মহিলাদের ডাবলস-এ বিজয়ীর জয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করে।

রুমানিয়ার জনসাধারণ তাদের এই প্রিয় টেবিল টেনিস পটীয়সীকে প্রাণ অপেক্ষা বেশী ভালবাসে। দেশের সম্মানকে বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে যিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর প্রতি নিছক কর্তব্যবোধেই রুমানিয়ার

উঁচু-নীচু সকল শ্রেণীর জনসাধারণ এগিয়ে আসেনি—রোজেনুকে তারা ভালবেসেছে অন্তর দিয়ে। তাঁর অমায়িক ব্যবহার, নিষ্ঠা ও ক্রীড়াকুশলতার জন্য রুমানিয়ার অধিবাসী মাত্রই গর্ববোধ করে। খেলাধুলায় দেশকে জগৎ-সভার পুরোভাগে স্থান করে দেবার প্রচেষ্টায় রোজেনু সদাই উদগ্রীব। তাই রুমানিয়ার খেলাধুলা-ক্ষেত্রে রোজেনুর স্থান সকলের পুরোভাগে। রাষ্ট্রের খেলাধুলার শ্রেষ্ঠ সম্মান 'মেরিটেড মাস্টার অব্ স্পোর্টস' পদবীর তিনি অধিকারিণী। লণ্ডন, মস্কো, টোকিও, ভিয়েনা এবং ভারতের ঘরে ঘরে তাঁর নাম—তাঁর নাম টেবিল টেনিস ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

## বড় গামা পালোয়ান

পৃথিবীর মধ্যে যত রকমের খেলাধূলা দেখা যায় তার মধ্যে কুস্তি বা মল্লযুদ্ধই হলো প্রাচীনতম। মানুষ একদিন বাঁচবার তাগিদে মল্লযুদ্ধকে গ্রহণ করেছিলো। শিক্ষা-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আজ অনেক শক্তিশালী মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। মল্লযুদ্ধ করে বন্য পশুদের হাত থেকে বা শত্রুর হাত থেকে রেহাই পাবার প্রয়োজন আজ আর তেমন নেই, তবুও মানুষ মল্লযুদ্ধকে ত্যাগ করেনি। ভারতের মাটিতেই প্রথম অনুশীলন সুরু হয়েছিল মল্লযুদ্ধের। ভারতীয় মল্লবীরেরা পৌরাণিক যুগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মল্লবীর হিসাবে বারে বারে স্বীকৃত হয়েছিলেন। শ্রেষ্ঠ মল্লবীর হিসাবে ভীম, ঘটোৎকচ, জরাসন্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, হনুমান, বালী ও সুগ্রীবের নাম কে না জানে! অবশ্য, ভারতীয় মল্লবীরদের সুনাম ও ঐতিহ্য এর পরেও বিশ্বসভায় স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে দীর্ঘ ব্যবধানের পর ভারতের সেই পুরাতন ঐতিহ্য ও সাধনাকে যিনি উদ্ধার করে বিশ্বের দরবারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি হলেন বড় পালোয়ান —বড় গামা। বিদেশে সমর্থকহীন অবস্থায় তিনি নিজের শক্তি ও কৌশলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পালোয়ানদের একে একে পরাজিত করে শুধু মাত্র নিজের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিষ্ঠা করেন নি—পরবর্তীকালের মল্লযোদ্ধাদের বিশ্ববিজয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পুনর্জীবিত করেছেন।

অবিভক্ত পাঞ্জাব ভারতের বহু কীর্তিমান মল্লযোদ্ধা-প্রসবিনী বলে গর্ব করতে পারে। এই পাঞ্জাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে বহু খ্যাতিমান মল্লযোদ্ধা জন্মগ্রহণ করে ভারতের সম্মান ও গৌরবকে বর্ধিত করেছেন। বড় গামার জন্মস্থানও পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে। কোন বিষয়ে সাফল্য লাভ করতে হলে একনিষ্ঠ সাধনা ও ঐকান্তিক আগ্রহের প্রয়োজন। ছেলেবেলা থেকেই বড় গামার মাঝে মল্লযুদ্ধের জন্য সেই ঐকান্তিকতা ও কঠিন সাধনা করবার আগ্রহ

দেখা যায়। মল্লযুদ্ধের মধ্যে তিনি তাঁর জীবনের সকল সুখ ও আনন্দের সন্ধান পান। আখড়ার মাটি ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। আখড়ার মাটিতে নিজের বুক রেখে তিনি পড়ে থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সেই মাটিকে নিজের মুঠিতে ধরে মনে মনে বলতেন—

"এই মাটি স্বপ্নে ঘেরা এই যে মৃত্তিকা
অপরূপ রসায়ন টিকা"—

উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত দ্যোতিয়া রাজ্যের পালোয়ান মীরাবক্স ভুক্কিওয়ালার কাছে বড় গামার 'বন্দেশ' (নিয়মিত কুস্তির চর্চা) স্থরু হয়। মীরাবক্স পালোয়ান দূর সম্পর্কে বড় গামার আত্মীয় ছিলেন। নিজের চেষ্টায় ও গুরুর শিক্ষা-কৌশলে ক্রমেই গামার নাম ছড়িয়ে পড়ে। দ্যোতিয়াতে শিক্ষানবীশ থাকা অবস্থাতেই তিনি বিভিন্ন লড়াইতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ পালোয়ান গোলামউদ্দিনকে পরাজিত করবার পর বড় গামা সারা ভারতে নিজেকে পরিচিত করতে সক্ষম হন। একে একে ভারতের সকল খ্যাতনামা মল্লযোদ্ধা বড় গামার কাছে পরাজিত হতে থাকেন। দু-এক বছরের মধ্যেই একমাত্র কাল্লু ও রহিম পালোয়ান ছাড়া বড় গামার সমকক্ষ ভারতে অন্য কোন পালোয়ান খুঁজে পাওয়া যায় না।

রহিম পালোয়ান ও গামার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এ কথা প্রমাণের জন্য প্রথম লড়াই হয় দ্যোতিয়াতে, কিন্তু ১৫।২০ মিনিট লড়াই চলবার পর দ্যোতিয়ার মহারাজা তাঁর খুশিমত লড়াই বন্ধ করে দেন। যাই হোক, উভয় পালোয়ান নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করার সুযোগ আবার খুঁজতে থাকেন। দ্বিতীয় লড়াইয়ের ব্যবস্থা হয় ইন্দোরে। তিন ঘণ্টা ধরে লড়াই চলবার পরেও কোন পালোয়ান অপরের কাছে নতি স্বীকার করেন না। পুনরায় লাহোরে তৃতীয়বার এই দুই পালোয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু এবারেও দু ঘণ্টা ধরে ভীষণতম মল্লযুদ্ধের পর ফলাফল থাকে অমীমাংসিত।

১৯১০ সালে এক বিদেশী সার্কাস দলের সাহায্যে এবং

শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্রের চেষ্টায় বড় গামা আরও কয়েকজন ভারতীয় কুস্তিগীরদের সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতীয় কুস্তিগীরদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যাত্রা করেন। হোটেলে বসেই দিন কেটে যায়। কোন কুস্তিগীর এগিয়ে আসে না লড়বার জন্যে। অবজ্ঞায় বিকৃত মুখে ইউরোপ ও আমেরিকার কুস্তিগীরেরা পরস্পর বলাবলি করে—'a bunch of fat, mild poets from the East'—ওরা কুস্তির কি জানে—ওদের সঙ্গে আমরা কি লড়বো? রাগে অপমানে গামার রক্তের মধ্যে উন্মত্ত তাণ্ডবের সুরু হয়। অবশেষে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মল্লবীর ডাঃ বি. এফ. রোলা সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন বড় গামার সঙ্গে কুস্তি করতে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হতে না হতেই দেখা যায় কোন এক বিস্ময়কর প্যাঁচে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মল্লবীর। মল্লযুদ্ধে আমেরিকার দীর্ঘদিনের শ্রেষ্ঠত্ব এইভাবে এক কালা আদমীর কাছে লুণ্ঠিত হতে দিতে রাজী হন না ডাঃ রোলা ও তাঁর সমর্থকেরা। দ্বিতীয়বার রোলা ও গামার মধ্যে তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এবারেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রোলাকে ভারতীয় কুস্তির উন্নত কৌশলের কাছে মাথা নত করতে হয়—মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হয় কালা পালোয়ানের শ্রেষ্ঠত্ব। বিদেশী কুস্তিগীরেরা তখনও বড় গামাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসাবে স্বীকার করে নিতে চান না। তাই ঠিক হয়, পোল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর জিবিস্কোকে যদি বড় গামা পরাজিত করতে পারেন তাহলে তাঁকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হবে। বড় গামা তাতেই রাজী হন। লণ্ডনে এই কুস্তি অনুষ্ঠিত হয়। ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ধরে প্রথম দিনে লড়াই চললেও কোন জয়-পরাজয়ের মীমাংসায় পৌছানো সম্ভব হয় না। এক সপ্তাহ পর আবার লড়াইয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে জিবিস্কোকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতীয় মল্লযোদ্ধার শ্রেষ্ঠত্বের কাছে নিশ্চিত পরাজয় বরণ করতে হবে জেনে জিবিস্কো গামার সম্মুখীন

হতে সাহসী হন না। বড় গামাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না ইউরোপ ও আমেরিকার কুস্তিগীরদের। 'জন বুল ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ বেল্ট' বড় গামাকে পরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু জাপানের সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ মল্লবীর টারো মায়াকা বড় গামাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসাবে স্বীকার করে নিতে অস্বীকৃত হয়ে গামাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেন। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে যুযুৎসু রপ্ত সেই জাপানী কুস্তিগীরকে সম্পূর্ণ 'চিৎ' অবস্থায় গামার কাছে পরাজিত হতে দেখা যায়।

ইউরোপ ও আমেরিকায় বিজয়কেতন উড়িয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধার আসন লাভ করলেও নিজের দেশে বড় গামা তখনও শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারেন নি। তিন তিনবার রহিম পালোয়ানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও তিনি পরাজিত করতে পারেন নি রহিমকে। তাই দেশে ফিরে এসে দেশের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করার জন্য বড় গামা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। ১৯১১ সালে রহিম পালোয়ানকে পুনরায় তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেন। এলাহাবাদে এই লড়াই অনুষ্ঠিত হয়। বিচারকের আসন গ্রহণ করেন এলাহাবাদের বৃটিশ পুলিশ কমিশনার। ভারতীয় কুস্তিগীরদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'গুরুজ' রাখা হয় বিজয়ীর পুরস্কার হিসাবে। ভারতের প্রায় সকল রাজ্য থেকে অসংখ্য মল্লবীর ও উৎসাহী দর্শক এই বিখ্যাত লড়াই দেখবার জন্য এসে জমায়েত হন এলাহাবাদে। ভারতে রহিম শ্রেষ্ঠ, না বড় গামা—শ্রেষ্ঠ দীর্ঘদিনের এই অমীমাংসিত প্রশ্নের মীমাংসা জানবার আশায় অধীর আগ্রহে অগণিত দর্শক অপেক্ষা করতে থাকে।

৪৫ মিনিট ধরে এই দুই বিখ্যাত পালোয়ান নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অমিতবিক্রমে লড়াই করতে থাকেন। হঠাৎ রহিম পালোয়ান পাঁজরায় আঘাত পাওয়ায় আর লড়তে রাজী হন না।

কিন্তু খেলাধুলার কোন প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড় আহত হলে প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায় না। আহত হওয়া দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক এবং এই দুর্ভাগ্যের কবলে পড়ে কত ব্যষ্টি বা সমষ্টি নিশ্চিত জয়লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে এ কথাও কারো অজানা নেই, তবুও নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ করতে হয়েছে—এই হলো খেলাধুলার আবহমান কালের রীতি ও নীতি। ইংরেজ পুলিশ কমিশনার সেই কথারই পুনরুল্লেখ করা সত্ত্বেও রহিম আর লড়তে রাজী না হওয়ায় বড় গামা বিজয়ীর পুরস্কার 'গুরুজ' লাভ করেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ পালোয়ানের মর্যাদা 'রুস্তম-ই-হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত করা হয় বড় গামাকে।

দীর্ঘদিনের অতৃপ্ত বাসনা ও আকাঙ্ক্ষিত কামনা পূর্ণ হওয়ায় দেহ ও মনে বড় গামা এক অভূতপূর্ব শক্তি অনুভব করেন। ভারতের রাজ্যে রাজ্যে তাঁর বিজয়কেতন উড়তে থাকে। চান্দা সিং, গোরা, কালা-প্রোতাবা প্রভৃতি পালোয়ান তাঁর কাছে পরাজিত হয়,—পরাজিত হয় ইন্দোরের বিখ্যাত পালোয়ান কামরুদ্দিন-আল-মাসুর আলি খান। গামু বালিওয়ালা ও বিদ্যোদয় ব্রাহ্মণকে পরাজিত করবার পর ভারতে গামার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার দ্বিতীয় কোন পালোয়ান অবশিষ্ট থাকে না। ১৯১৬ সালে হোসেন বক্স মূলতানিয়াকে পরাজিত করায় বাংলার লাট বাহাদুর বড় গামাকে একটি সুন্দর 'গুরুজ' উপহার দেন। ১৯২৮ সালে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য জিবিস্কো এসে হাজির হন ভারতে। পাতিয়ালার মহারাজা জিবিস্কো ও গামার মধ্যে লড়াইয়ের ব্যবস্থা করে দেন। গামার প্রথম আক্রমণের বেগ জিবিস্কো সামলাতে পারেন না। এক বিস্ময়কর প্যাঁচের ক্ষিপ্র ও ভীষণতম আঘাতে পোল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর গামার কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হন। এর পর বড় গামা ঘোষণা করেন যে, যদি কোন পালোয়ান তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান, তাহলে আগে সেই পালোয়ানকে তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর ইমাম বক্সকে পরাজিত

করে নিজেকে যোগ্য হিসাবে প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু জ্যেষ্ঠের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত ইমাম বক্সকে পরাজিত করে অন্য কোন পালোয়ান গামার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার যোগ্যতা লাভ করতে পারেন না। বড় গামা তাই ভারতে তথা সারা বিশ্বে অপরাজিত ও অজেয় আখ্যা নিয়ে মল্লবীরের জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

কোন কোন বিদেশী লেখক বড় গামাকে অতিমানব হিসাবে প্রমাণ করবার জন্যে—একাকী গহন বনে হিংস্র বাঘকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করা, বন্য বরাহকে শুধুমাত্র একখানি ছুরির সাহায্যে সম্পূর্ণ পরাজিত ও নিহত করা, ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত কোন মেষকে তলোয়ারের এক আঘাতে শির দ্বিখণ্ডিত করা বা নেকড়ের গুহায় ঢুকে সেই নেকড়েকে জীবন্ত অবস্থায় রজ্জুবদ্ধ করে নিয়ে আসা প্রভৃতি অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণা করেছেন। কিন্তু গামার যাঁরা অনুচর বা গামার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সঙ্গে যাঁদের নিকটতম পরিচয় আছে, তাঁরা এই সব তথ্যের কোন গুরুত্ব দেন না।

ভারতে বহু বিখ্যাত ও শক্তিশালী মল্লবীর জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের সুগঠিত দেহ, বিরাট বক্ষদেশ, উন্নত পেশীসমূহ দর্শকদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করেছে। বড় গামা ছিলেন সেই সব সুদেহী মল্লবীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ। ভারতের কথা দূরে থাক্, সারা বিশ্বে বড় গামার মত সুপুরুষ মল্লযোদ্ধা খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন নিরহঙ্কার, বিনয়ী ও চরিত্রবান। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মল্লযোদ্ধার কাছে ছিলেন তিনি শ্রদ্ধার পাত্র। পাতিয়ালার মহারাজা এই শক্তিমান পালোয়ানকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আহার ও বাসস্থান ছাড়াও এক হাজার টাকা মাসোহারা দিয়ে গামাকে দীর্ঘদিন প্রতিপালন করে গেছেন তিনি। ভারত বিভক্ত হবার পর আজ বড় গামা পাকিস্থানের নাগরিক। কিন্তু আজও ভারতীয় মল্লবীরেরা তাঁদের আদর্শ মল্লবীরের কথা স্মরণ করে গর্ব বোধ করেন। বিশ্বের মল্লযুদ্ধের ইতিহাসে বড় গামার কীর্তিগাথা কোনদিন ম্লান হবে না।
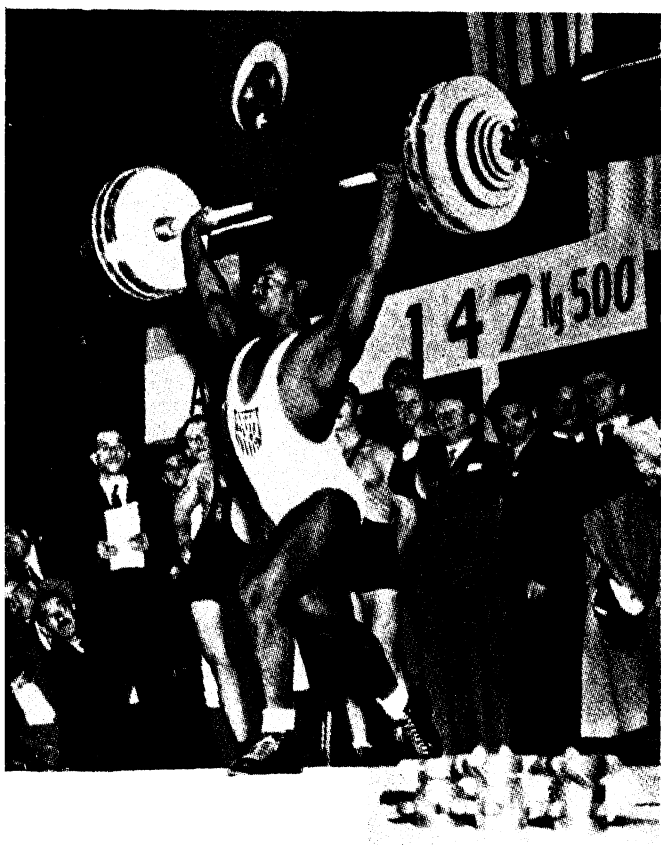
হেভিওয়েট ভারোত্তোলনের শ্রেষ্ঠ বীর জন ডেভিস

## জন ডেভিস

আমেরিকার এক মটর মেরামতি কারখানায় হঠাৎ একদিন ৩,০০০ পাউণ্ডের একখানি ট্রাক কিভাবে উল্টে যায়। ট্রাকের নীচে একজন মিস্ত্রী চাপা পড়ে—"কে কোথায় আছ, আমায় বাঁচাও" বলে আর্তস্বরে চিৎকার করতে থাকে। ছোট্ট কারখানা। লোকজন কম। ক্রেণ লাগিয়ে, চেন বেঁধে ঐ গাড়ী তুলতে যে সময়ের দরকার অত দেরি করলে লোকটির বাঁচার কোন আশা থাকবে না। আবার এত লোকও কারখানায় নেই যে হাতে হাতে ঐ ট্রাকটিকে ঠেলে উঁচু করে তুলতে পারে। যন্ত্রণাকাতর চিৎকার আরও বেড়ে চলে —"বাঁচাও, বাঁচাও, মরে গেলাম।" কাতর চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে কারখানা থেকে আর একজন মিস্ত্রী দৌড়ে এসে ট্রাকটির তলে কোনরকমে নিজের দেহটিকে গলিয়ে দেন। শরীরের সমস্ত শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে কাঁধ লাগিয়ে সেই ট্রাকটিকে উঁচু করবার চেষ্টা করতে থাকেন তিনি। তাঁর বিরাট পেশীবহুল দেহের প্রত্যেকটি পেশীও ঐ ট্রাকটির উপর আক্রোশে ফুলে ওঠে। ট্রাকটি প্রথমে একটু নড়ে ওঠে, তারপর উঁচু হতে থাকে ধীরে ধীরে। মুষ্টিমেয় যে কয়জন এই অসমসাহসিক ও অমিতশক্তির নিদর্শন দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল তারা সহসা তাদের সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ঐ ট্রাকের নীচে চাপাপড়া মিস্ত্রীকে টেনে বের করে নিয়ে আসে। তারপর ট্রাকের নীচ থেকে নিজে বেরিয়ে আসেন সেই অসম নিগ্রো মিস্ত্রী তার ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে। দেহের নানাস্থান দিয়ে তখনও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। প্রত্যেকটি লোমকূপের গোড়া থেকে ঝরে পড়ছে শ্রান্ত দেহের স্বেদবিন্দু। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সেই নিগ্রো যুবক ছুটে যান আহতের কাছে। পাশে বসে ভালো করে পরীক্ষা করেন আহতের আঘাতগুলি। আঘাত তেমন গুরুতর নয় জেনে নিশ্চিন্ত মনে আবার ফিরে যান নিজের কাজে। বন্ধুরা বলাবলি করে,

"সাবাস, জন ডেভিস। তোমার মত শক্তিধরের পক্ষেই এ সম্ভব।"

ভারোত্তোলনে জন ডেভিসের মত কৃতিত্ব ও গৌরব অন্য কোন ভারোত্তোলনকারী আজও লাভ করতে পারেন নি। ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে উপর্যুপরি দুটি অলিম্পিকের হেভিওয়েট বিভাগে তিনি শুধু বিজয়ীর সম্মান লাভ করে ক্ষান্ত হন নি,—অর্জিত সম্মানকে ২৪টি অলিম্পিক রেকর্ডের মাধ্যমে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন তিনি। 'মিলিটারী প্রেস', 'স্ন্যাচ' এবং 'ক্লিন এ্যাণ্ড জার্ক'-এ তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই ২৪টি রেকর্ডের মধ্যে সাবলীল ভঙ্গিমায় ৪০২ পাউণ্ড ওজন তোলার রেকর্ড সাধারণের কাছে একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা হয়ে রয়েছে। দীর্ঘ ১১ বছর ধরে ডেভিস বিশ্বের শৌখিন ভারোত্তোলনের হেভিওয়েট বিভাগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। তাঁর বিস্ময়কর কৃতিত্বে মুগ্ধ ফ্রান্স, জার্মাণী, সুইডেন, স্পেন, ইংলণ্ড এবং ইজিপ্ট তাঁকে নাগরিকত্বে বরণ করে নেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছে, প্রলোভন দেখিয়েছে প্রচুর অর্থের, সুদৃশ্য অট্টালিকার। কোন মুসলমান রাষ্ট্র হারেমের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর কমনীয় দেহবল্লরীর আকর্ষণের উল্লেখ করা সত্ত্বেও ডেভিস হাসিমুখে জবাব দিয়েছেন—"I am happily married to one wife and one country."

ডেভিস ভারোত্তোলনে অবিশ্বাস্য ইতিহাস রচনা করতে সমর্থ হলেও বাল্যকাল থেকে কিন্তু তিনি ভারোত্তোলনের অনুশীলন আরম্ভ করেন নি। এ্যাথলেটিকস ও জিমনাষ্টিকেই তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশী। স্কুলের ছাত্র হিসাবে একদিন তিনি সহপাঠী এক বন্ধুর সঙ্গে খেলার মাঠে বাজী ধরে ১২৫ পাউণ্ড ওজনের একটা জমানো সিমেণ্টের খণ্ডকে দুই হাতে মাথার উপর উঁচু করে তুলে ধরেন। ঠিক সেই সময়ে স্টিভ উলস্‌কি নামে একজন খ্যাতিমান শৌখিন ভারোত্তোলনকারী সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এই কিশোর যুবকের অপূর্ব ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে যে ভারোত্তোলনের এক

বিস্ময়কর ক্ষমতা নিহিত আছে এই বালকের মধ্যে। উলস্‌কি ডেভিসকে সঙ্গে করে নিয়ে যান নিজেদের ব্যায়ামশালায়। ১৬ বছরের যুবক ডেভিস ক্রমেই ভারোত্তোলনের উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্রের কাছে পরাজিত হতে হয় গুরুকে। মাত্র ১০ মাস ব্যবধানে আমেরিকার জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার ব্যাণ্টামওয়েট বিভাগে যোগদান করে ডেভিস তৃতীয় স্থানের অধিকারী হন। জীবনে প্রথম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে ডেভিস যে পুরস্কার সেদিন লাভ করেছিলেন, আজও অত্যন্ত যত্নের সঙ্গেই সেই পুরস্কারটিকে তিনি কাছে রেখেছেন।

একাগ্র সাধনায় ডেভিসের নাম খুব তাড়াতাড়ি আমেরিকার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। মাত্র এক বছর পরে ১৯৩৮ সালের শেষাশেষি ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব-ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় লাইট হেভিওয়েট বিভাগে আমেরিকার পক্ষ সমর্থন করবার জন্য ১৭ বছরের যুবক ডেভিসকে জাহাজে করে ভিয়েনার পথে যাত্রা করতে দেখা যায়। এই সময়ে লাইট হেভিওয়েট বিভাগে অস্ট্রিয়ার ফ্রিট্জ হলার ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। এ ছাড়া ১৯৩২ ও ১৯৩৬ সালে উপর্যুপরি দু'বার অলিম্পিক বিজয়ী লুইস হেস্টিন যোগদান করায় লাইট হেভিওয়েট বিভাগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলার এবং হেস্টিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে বলে সকলে আশা করে। কিন্তু প্রতিযোগিতা-শেষে দেখা যায়, বিশ্ব ভারোত্তোলনে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক নবীন আগন্তুক 'মিলিটারী প্রেস', 'স্ন্যাচ' এবং 'ক্লিন এ্যাণ্ড জার্কে' মোট ৮১৫ পাউণ্ড ওজন তুলে বিজয়ীর জয়মাল্য লাভ করেছেন। ৮১৫ পাউণ্ডের মধ্যে 'ক্লিন এ্যাণ্ড জার্কে' ৩৩০ পাউণ্ড ওজন তোলা নবতম বিশ্ব রেকর্ড হিসাবে গণ্য হয়। ভারোত্তোলন ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগী হিসাবেও ডেভিস বিশ্ব-ভারোত্তোলনে বিজয়ীর পুরস্কার লাভ করেন। নিউ ইয়র্কে ফিরে এসে ডেভিসকে সংসারের অভাব মেটাতে বিভিন্ন কারখানায়, রেল অফিসে, এমন কি মোটর মিস্ত্রী হিসেবে কাজ

করতে হয়। ১৯৪১ সালে তিনি হেভিওয়েট বিভাগে প্রবেশ করেন। এই বছরেই ডেভিস ১০০৯¾ পাউণ্ড ওজন তুলে হেভিওয়েট বিভাগে নতুন বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকা জড়িত হয়ে পড়ায় আর পাঁচজনের মত ডেভিস সৈন্য বিভাগে যোগদান করতে বাধ্য হন। সৈন্য বিভাগের কঠিন পরিশ্রম এবং অনিয়ম তাঁর বলশালী দেহেও রোগের সৃষ্টি করে। ১৯৪৫ সালে যখন তিনি সৈন্য বিভাগ থেকে ছাড়া পান, তখন 'জণ্ডিস' ব্যাধির কবলে পড়ে তাঁর ৪৫ পাউণ্ড ওজন হ্রাস পেয়েছে। নিজের শরীর এরূপ ভেঙ্গে পড়ায় ডেভিস ভারোত্তোলন একেবারে ছেড়ে দেবেন বলে স্থির করেন। কিন্তু বব্ হপ্ম্যান ডেভিসকে তাঁর নিজের এবং জাতীয় স্বার্থের খাতিরে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতে বার বার অনুরোধ করতে থাকেন। সুহৃদ ও শুভাকাঙ্ক্ষী হপ্ম্যানের অনুরোধ ফেলতে পারেন না তিনি। আবার সুরু হয় ডেভিসের সাধনা। ১৯৪৬ সালে প্যারিসে বিশ্ব-ভারোত্তোলনের হেভিওয়েট বিভাগে জন ডেভিসকে পরাজিত করা কোন দেশের কোন ভারো-ত্তোলনকারীর পক্ষেই সম্ভব হয় না। নবতম বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করে বিশ্ববিজয়ীর আখ্যা লাভ করেন জন ডেভিস। এর পর তাঁর জয়যাত্রা সুরু হয় দিকে দিকে। ১৯৪৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিকে হেভিওয়েট বিভাগে বিজয়ীর সম্মান সহজেই তাঁর করায়ত্ত হয়।

১৯৫০ সালে বিশ্ব-ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় রাশিয়া যোগদান করায় সারা বিশ্বের ভারোত্তোলনকারীদের মধ্যে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। রাশিয়ার জেকব-কুটসেনকোর অনুশীলন দেখে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন যে হেভিওয়েট বিভাগে ডেভিসকে এবারে হার স্বীকার করতে হবে রাশিয়ার প্রতিনিধির কাছে। প্রতিযোগিতা সুরু হতে কুটসেনকো ঘোষণা করেন, 'স্ন্যাচে' ২৯৭ পাউণ্ড থেকে তিনি তুলতে সুরু করবেন। ডেভিসকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি বলেন, 'আমিও তবে ঐ একই ওজন থেকে সুরু করবো।'

কুটসেনকো এতে আপত্তি করায় ডেভিস হাসতে হাসতে জবাব দেন, 'বেশ, তাহলে আরও বেশী অর্থাৎ ৩০৮ পাউণ্ড থেকে আমি স্থুরু করবো।' যাই হোক্ কুটসেনকো শেষ পর্যন্ত অতি কষ্টে ৩০৮ পাউণ্ড ওজন তুলতে সমর্থ হন; কিন্তু ডেভিস প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে ১৭ পাউণ্ড বেশী তুলে 'স্ন্যাচে' বিজয়ী হন। এর পর সুরু হয় 'ক্লিন এ্যাণ্ড জার্ক'। ৩৪১ পাউণ্ড পর্যন্ত তোলার পর কুটসেনকো যখন নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন, ডেভিস তখন ঘোষণা করেন, তিনি ৩৭৫ পাউণ্ড থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্থুরু করবেন। অগণিত দর্শক ও প্রতিযোগীরা বিস্ময়ে নির্বাক্ হয়ে যান। ভারোত্তোলনের নিয়ম অনুযায়ী কোন প্রতিযোগী একবার যে ওজনের কথা ঘোষণা করে, সেই ওজন কোনভাবেই আর কমানো চলে না। কিন্তু বিস্ময়ের মায়াজাল আরও বিস্তার করে ডেভিস সেই ৩৭৫ পাউণ্ড ওজন যখন তুলে ফেলেন তখন উপস্থিত সকল ভারোত্তোলনকারীরা ডেভিসের প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করতে বাধ্য হন। মোট ১০১৯ পাউণ্ড ওজন তুলে ডেভিস হেভিওয়েট বিভাগে পুনরায় বিশ্ববিজয়ীর গৌরব লাভ করেন।

১৯৫১ সালে মিলানে বিশ্ব-ভারোত্তোলন অনুষ্ঠিত হবার সময়ে ডেভিস উরুদেশে ভীষণভাবে আঘাত পান। কিন্তু অপরিসীম যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে নিজের বিশ্ববিজয়ী সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একের পর এক তিনি ভারোত্তোলন করে যেতে থাকেন। আহত হওয়া অবস্থাতেও বিশ্ববিজয়ীর মুকুট তাঁর কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারে না। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে 'প্রেস' ও 'স্ন্যাচে' নবতম অলিম্পিক রেকর্ড ও বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করে বিজয়ী হওয়ায় উপর্যুপরি দুটি অলিম্পিকের হেভিওয়েট বিভাগের স্বর্ণপদক তাঁর বক্ষদেশে শোভা পায়। দুটি অলিম্পিকের বিজয়ীর গৌরব ছাড়াও ১৯৪১ সালের এক সুন্দর প্রভাতে বিশ্ব-ভারোত্তোলনের হেভিওয়েট বিভাগে যে বিজয়ীর সম্মান তিনি লাভ করেছিলেন দীর্ঘ ১১ বছর অর্থাৎ ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সেই সম্মান ডেভিস অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হন।

ভারোত্তোলনের ইতিহাসে এতবড় প্রতিভা আর দেখা যাবে কিনা সন্দেহ।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিধর হিসাবে পরিগণিত হলেও নিজের শক্তির অহেতুক পরিচয় দিতে তিনি কখনই রাজী হন না। অবশ্য, বন্ধুবান্ধবের আনন্দবর্ধনের জন্য মাঝে মাঝে মোটা লোহার 'জ্যাক চেন' ছোঁড়া, 'ক্রো-বার' বাঁকানো এবং বোতলের 'কর্ক' আঙ্গুল দিয়ে চেপে চুপসে দেওয়া প্রভৃতি যে না-করেন তা নয়। রাস্তাঘাটে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মত এমন স্বাভাবিকভাবে তিনি চলাফেরা করেন যে অনেকে বুঝতেই পারে না, বস্ত্রের আবরণে যে বিরাট পেশীবহুল দেহটি রয়েছে তার ওজন ২২০ পাউণ্ড।

মানুষ জীবনে কত আশা করে। কল্পনার কত রঙিন ছবি সে আঁকে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই সেই আকাঙ্ক্ষিত আশা পূর্ণ হয় না। ডেভিসের মনের একান্ত বাসনা ছিল, সারা বিশ্ব তিনি পরিভ্রমণ করবেন। দেশে দেশে গিয়ে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানাবেন সেই সব দেশের শ্রেষ্ঠ ভারোত্তোলনকারীদের। কিন্তু সংসারের কঠিন আবর্তে নিজের কর্মজীবনের নানা গোলযোগে আজও তাঁর সে আশা সফল হয়নি। দোকানের কর্মচারী, ট্রাম চালক, সাধারণ মজুর, বারের কর্মচারী, এমন কি ইলেকট্রিক ওয়েল্ডার হিসাবেও তাঁকে জীবিকা অর্জন করতে হয়েছে।

সঙ্গীতে ডেভিসের জন্মগত আকর্ষণ আছে। ডেভিস নিজে খুব উঁচুদরের সঙ্গীতজ্ঞ না হলেও তাঁর সবচেয়ে বড় শখ পুরনো দিনের ভালো ভালো গানের রেকর্ড সংগ্রহ করে নিজের অবসর মুহূর্তে সেই গান শুনে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করা।